~ www.amarboi.com ~

চিত্তরঞ্জন
অথবা
যযাতির বৃত্তান্ত

হরিশংকর জলদাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নয়টি গল্প নয় রকমের। আবার নয়টি গল্পের মূলাধার একটি গ্রন্থ। সে 'মহাভারত'। 'মহাভারত' মানবজীবনের আকরগ্রন্থ। পাঁচহাজার বছরের পুরনো এই মহাকাব্যটি এখনো কীভাবে বাঙালি জীবনে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে আছে, এই গল্পগ্রন্থে তারই অনুসন্ধান চালিয়েছেন হরিশংকর জলদাস।

'সহোদর' গল্পে কুন্তীর হাহাকারের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে বর্তমানের কুমারী মা-দের আর্তনাদ। 'তুমি কে হে বাপু'তে ব্যাসদেবের সঙ্গে অদ্বৈত মল্লবর্মণের সাক্ষাৎ। এই গল্পে বিবর্ণ সম্প্রদায়ে জন্ম নেওয়া দুই মহাজনের বেদনা এক বিন্দুতে মিশেছে। 'সুরেন্দ্র গাওয়াল' ও 'ঢোলদাস' গল্প দুটোতে দুজন অন্যরকম মানুষের জীবনালেখ্য বর্ণিত। সুরেন্দ্র আর মনমোহনের মতো মানুষ আছে বলেই অশেষ ক্লেশের মধ্যেও জীবন এখনো অনেক আকর্ষণীয়। 'চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির বৃত্তান্ত' গল্পটিতে 'মহাভারতে'র আশ্রয়ে আপনারই জীবনকথা যেন রূপায়িত। 'কুন্তীর বস্ত্রহরণে' প্রাচীন ও বর্তমানকালের নারীলাঞ্ছনার বেদনা একাকার হয়ে অশ্রু বিসর্জন করছে। 'ব্যর্থ কামে' 'মহাভারতে'র পাণ্ডু বর্তমান কালের ধরণীবাবু হয়ে উপস্থিত।

বিষয়, ভাষা ও গল্পশৈলীর বৈচিত্র্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে হরিশংকর জলদাস আপনার ভেতরটাকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছেন। আপনার ভাবনায় নতুন সংযোজন 'চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির বৃত্তান্ত' গল্পগ্রন্থটি।

আমার বই

~ www.amarboi.com ~

আলোকচিত্র : মইন খান

১৯৫৫'র ১২ অক্টোবর জন্ম, চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গার জেলেপল্লিতে। সাতচল্লিশ বছর বয়সে লিখতে বসা, ঠেকায় পড়ে। লিখতে বসেছিলেন গবেষণাপত্র, লিখে ফেললেন 'জলপুত্র' উপন্যাসটি। 'জলপুত্র' হরিশংকর জলদাসকে মর্যাদার আসনে বসিয়ে দিল। নতুনধারার নতুন রকম উপন্যাস। পরের পরের বছরে বেরোল 'দহনকাল', 'কসবি', 'রামগোলাম', 'হৃদয়নদী', 'মোহনা', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'আমি মৃণালিনী নই', 'এখন তুমি কেমন আছ', 'একলব্য' উপন্যাসগুলো। তাঁর গল্পের বই–'জলদাসীর গল্প', 'লুচ্চা', 'হরকিশোরবাবু' 'কোনো এক চন্দ্রাবতী', 'মাকাললতা', 'বাছাই বারো' ও 'গল্পসমগ্র : ১'। বাংলা একাডেমি থেকে বেরিয়েছে তাঁর ডক্টরাল থিসিস 'নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন'। অন্যান্য গদ্যগ্রন্থ–'কৈবর্ত কথা', 'নিজের সঙ্গে দেখা', 'জীবনানন্দ ও তাঁর কাল', 'লোকবাদক বিনয়বাঁশী', 'বাংলা সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ'।

হরিশংকর জলদাস কাহিনী লিখেন না শুধু, সমাজকেও লিখেন। কথাসাহিত্যে ব্যতিক্রমী হাওয়া নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন তিনি। তাঁর চরিত্ররা সমাজের প্রান্তজন– জেলে, বীরাঙ্গনা, মেথর, কোটনা, মুচি, খুনি। সাহিত্যকর্মের জন্য পেয়েছেন 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার' (জলপুত্র), 'প্রথম আলো বর্ষসেরা বই পুরস্কার' (দহনকাল), 'সিটি আনন্দ আলো পুরস্কার' ও 'বাংলাদেশ মানবাধিকার সম্মাননা পদক' (রামগোলাম), 'ব্র্যাকব্যাংক সমকাল সাহিত্য পুরস্কার' (প্রতিদ্বন্দ্বী)।

কথাসাহিত্যে সার্বিক অবদানের জন্য পেয়েছেন 'অবসর সাহিত্য পুরস্কার', 'ড. রশিদ আল ফারুকী সাহিত্য পুরস্কার'।

কথাসাহিত্যে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' পেয়েছেন ২০১২ সালে।

~ www.amarboi.com ~

চিত্তরঞ্জন

অথবা

যযাতির বৃত্তান্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হরিশংকর জলদাস

চিত্তরঞ্জন

অথবা

যযাতির বৃত্তান্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

অবসর

~ www.amarboi.com ~

©
লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৬

অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
সব্যসাচী হাজরা

লেখকের ছবি : প্রত্যুষ শংকর

মূল্য ২২৫.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978-984-8797-49-5

Cittaranjon athoba Jajatir Brittanta (Short Stories) by HARISHANKAR JALADAS
Published by ABOSAR. 46/1 Hemendra Das Road, Sutrapur, Dhaka-1100.
First Edition February 2016. Price Taka 225.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : মেসার্স প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ
৭১১৫৩৮৬, ৭১২৫৫৩৩
০১৭৪৩৯৫৫০০২, ০১৬২৬০২৪০৯০

বিকাশ পেমেন্ট
০১৭২০৩০৪০৭২

Website **www.abosar.com, www.protikbooks.com**
Facebook : www.facebook.com/AbosarProkashanaSangstha
e-mail protikbooks@yahoo.com, abosarprokashoni@yahoo.com
Online Distributor | www.rokomari.com, Phone 16297, 01833168190
www.akhoni.com, Phone +88 096-11 55 77 88

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উ ৎ স র্গ

রবিশংকর জলদাস
তারাশংকর জলদাস
সঞ্জয়শংকর জলদাস

তিন সহোদরকে।

যাদের ভালোবাসায় আর শ্রদ্ধায়
আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূচি

আজকের দ্রৌপদী ১১
সুরেন্দ্র গাওয়াল ২৩
তুমি কে হে বাপু ৩৭
কুন্তীর বস্ত্রহরণ ৪৯
চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির বৃত্তান্ত ৬৩
যমুনাজলে বিবর সন্ধান ৭৭
ব্যর্থ কাম ৮৯
সহোদর ৯৭
ঢোলদাস ১০৯

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিত্তরঞ্জন

অথবা

যযাতির বৃত্তান্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আজকের দ্রৌপদী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এক.

দুটো বাড়ি, পাশাপাশি।

সেনবাড়ি আর ধরবাড়ি। মাঝখানে পাঁচিল, মাথা সমান। বাড়ি দুটোর মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল, আগে। ভালো রান্না হলে এবাড়ির তরকারি ওবাড়িতে যেত, শীতে ওবাড়ির পিঠে এবাড়িতে আসত, আগে। এখন আসে না। আগে সেনবাড়ির ছেলেপুলেরা ধরবাড়ির উঠানে খেলতে যেত, এখন যায় না। ধরবাড়ির ছোটরা সেনবাড়িতে খেলতে খেলতে খাটে ঘুমিয়ে পড়ত, সেনগিন্নি কোলে করে ঘুমন্ত বাচ্চাকে ধরবাড়িতে পৌঁছে দিতেন, এখন দেন না। দুই বাড়ির মাঝখানে এখন কন্‌ক্রিটের দেয়াল।

সেনবাড়ির কর্তা প্রতুল সেন, চন্দ্রবিকাশ ধর ওবাড়ির গার্জেন। প্রতুলবাবু টিঅ্যান্ডটি'র কর্মকর্তা আর ধরবাবু অ্যাডভোকেট। একজন নন্দনকাননে অফিস করেন, অন্যজন চট্টগ্রাম কোর্টবিল্ডিং-এ প্র্যাকটিস করেন। দুজনের মধ্যে গলায় গলায় ভাব। ছুটিছাঁটার দিনে একসঙ্গে বসে ধরে আর সেনে গল্প হয়, সুখদুঃখের কথা বিনিময় হয়।

সেনবাবুর ফলদগাছের প্রতি বড় টান, বাড়ির চারপাশে গাছ লাগান। ধরবাবুর গাছের প্রতি তেমন টান নেই। বলেন,' গাছটাছ লাগিয়ে কী হবে? শুধু পাতাপুতার আবর্জনা। তার চেয়ে খালি জায়গা ভালো। আলো-বাতাসের অবাধ খেলা।'

সেনবাবু নাছোড়। ধরবাবুকে গাছ লাগাতেই হবে। ডবল ডবল গাছ কেনেন। একটা এবাড়িতে লাগালে আরেকটা ধরবাড়িতে লাগান। গাছ বড় হয়। এবাড়ির গাছের ডাল ওবাড়ির সীমানায় যায়। ধরবাড়ির নারকেলগাছের কাঠবিড়ালি-খাওয়া কচি ডাব সেনবাড়ির টিনের চালে পড়ে। সেনবাড়ির গিন্নি উঠানে দাঁড়িয়ে কাঠবিড়ালি তাড়ান, 'শ, শ! হুশ! যা যা মরার কাঠবিড়ালি।' তারপর গলা উঁচিয়ে বলেন, 'ও শ্যামাদি, কাঠবিড়ালি তো সব নারকেল খেয়ে শেষ করল।'

কালক্রমে উভয় বাড়ির ছেলেপুলেরা বড় হতে লাগল। প্রাইমারি স্কুল পেরিয়ে হাইস্কুল। তারপর কলেজ। উভয় বাড়ির জৌলুস বাড়তে থাকল। বেড়ার ঘরের জায়গায় একতলা বাড়ি তুললেন ধরবাবু। আর প্রতুল সেনের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভিটেয় উঠল দোতলা বাড়ি। তাঁর ইনকাম বেশি। টিঅ্যান্ডটির চাকরিতে ঘুষঘাষের সুযোগসুবিধেও বেশি। উভয় পরিবারে ধনের বৈষম্য যা-ই হোক, মনের মালিন্য হয় না কখনো। পারিবারিক সম্পর্ক আগের মতোই অটুট থাকে। সেনবাবুর তিন ছেলে, এক মেয়ে। ধরবাবুর একটাই সন্তান, ওই প্রভাসচন্দ্র ধর। কল্যাণ সেন ছাড়া প্রতুলবাবুর অন্য দুটো ছেলেই অকাজের। কল্যাণ বড়, মেজটা উচ্চমাধ্যমিক পাস করে আর পড়ল না। ছোটটা হাবাগোবা। ঠেলেঠুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত এগিয়েছিল। মেয়ে শাশ্বতী ভীষণ সুন্দরী। এক কানাডানিবাসী বর শাশ্বতীর প্রতি বড় আগ্রহী হয়ে উঠল। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ওই প্রবাসীকেই মাধ্যমিক পাস শাশ্বতীকে বিয়ে দিলেন সেনবাবু। কল্যাণ সেন ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করল, চুয়েট থেকে। নামকরা একটা প্রাইভেট ফার্মে উঁচু বেতনে চাকরি পেল কল্যাণ।

প্রভাস আর্টস নিয়ে লেখাপড়া করল। উচ্চমাধ্যমিক পাস করার পর অনার্সে ভর্তি হল, বাংলায়। ক্রমে অনার্স, এমএ পাস করল প্রভাস। বিসিএস দিয়ে সরকারি কলেজে অধ্যাপনার চাকরিও পেল।

কল্যাণের মাঝারি হাইট, সুঠাম দেহ। উজ্জ্বল রং। চেহারায় একটু কঠোর কঠোর ভাব। সেটা জন্মগত। রাগী নয় সে, তবে চেহারা রাগী রাগী। প্রভাস দীর্ঘদেহী। স্বাস্থ্য ভালো। কল্যাণের মতো বনেদি চেহারা নয় তার, তবে একধরনের স্নিগ্ধ কোমলতা তাকে সর্বদা ঘিরে রাখে। তার উন্নত নাসা। নাকের দু'পাশে উজ্জ্বল দুটো চোখ। চোখের সৌন্দর্যের জন্যই শুধু প্রভাসকে ভালোবাসা যায়। কম কথা বলা, সৌম্য আচরণ প্রভাসের বাড়তি গুণ।

কল্যাণ আর প্রভাসের মধ্যে রেষারেষি, ছোটবেলা থেকে। স্কুলের পড়ালেখায় কল্যাণ কিছুতেই প্রভাসকে পেছনে ফেলতে পারত না। অন্যান্য সাবজেক্টে মাঝেমধ্যে এগিয়ে থাকলেও ইংরেজি আর গণিতে প্রভাসকে অতিক্রম করতে পারত না কল্যাণ। এজন্য তার মনে চাপা ক্রোধ। সেই ক্রোধ এক বিকেলে বেরিয়ে এল।

সবে নাইনে উঠেছে তারা। একই স্কুলে, একজন সায়েন্সে আরেকজন আর্টসে। শীতবিকেলে স্কুলমাঠে ব্যাডমিন্টনের আসর বসেছে। সিনিয়ররা খেলা ছেড়ে দিলে কল্যাণ আর প্রভাস ব্যাট হাতে নিল। দুজনে দুদিকে দাঁড়াল। অল্পক্ষণের মধ্যে খেলা জমে উঠল। দুজনেই চৌকস। তবে প্রভাসের খেলায় কারুকার্য বেশি। দর্শকও জুটে গেল অনেক। উভয়েই এক এক সেটে জয় পেল। তৃতীয় সেট চলছে। দর্শকরা উত্তেজিত। ঘন ঘন হাততালি দিচ্ছে। কেউ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এদিকে, কেউ ওদিকে। প্রভাসের জন্য যেন হাততালি বেশি। দর্শকের উত্তেজনা প্রভাস-কল্যাণের মধ্যে সংক্রমিত হল। মরণপণ লড়াইয়ে মগ্ন হল উভয়ে। এ চাপ দিলে ও ফিরিয়ে দিচ্ছে। ও নেট ঘেঁষে কর্ক ফেলতে চাইলে এ ত্বরিত এসে তা ওপারে পাঠিয়ে দিচ্ছে। একটা সময়ে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, কেহ নাহি হারে জিতে সমানে সমান। তৃতীয় সেটে জয় পেল প্রভাস। কল্যাণ মুখ গোমড়া করে মাঠ ছাড়ল। সেই থেকে উভয়ের মধ্যে রেষারেষি আরও বেড়ে গেল।

একদিন ধর-দম্পতি সিদ্ধান্ত নিলেন– ছেলেকে বিয়ে করাবেন। ছেলে তো এখন সরকারি মহিলা কলেজে পড়ায়। বেতনও কম পায় না। প্রভাসের বয়সও ঊনত্রিশ পেরিয়ে গেছে। ধরগিন্নি প্রভাসের মনোভাব জেনে নিলেন। বিয়েতে প্রভাসের আপত্তি নেই। ভেতরে ভেতরে মেয়েরও খোঁজখবর নেওয়া শুরু করলেন চন্দ্রবিকাশ ধর। মেয়ে পাওয়াও গেল। নন্দনকাননের চৌধুরীবাড়ির মেয়ে। জীবন চৌধুরীর মানি-এক্সচেঞ্জের কাজকারবার। হাজারিগলিতে অফিস। জীবন চৌধুরীর একমাত্র কন্যা অহনা চৌধুরী। চট্টগ্রাম কলেজে দর্শনে এমএ পড়ছে। সুশ্রী, লাবণ্যময়ী। মিতভাষী। অহনার বড় গুণ– তার মধ্যে সুন্দর একটা মন আছে।

বন্ধু দিলীপকে দিয়ে প্রাইমারি কথাবার্তাও সেরে নিয়েছেন ধরবাবু। কনে দেখাতে রাজি হয়েছেন জীবন চৌধুরী। তারিখও নির্ধারিত হয়ে গেছে। সেনবাবুর সঙ্গে আলাপ না করে কনে দেখতে যান কী করে ধরবাবু! এক বিকেলে সেনবাড়িতে উপস্থিত হলেন চন্দ্রবিকাশবাবু। ভূমিকা ছাড়া বললেন, 'বুঝলে প্রতুল, ছেলের বিয়ে দেব ঠিক করেছি। তোমার মতামত দরকার। তাই এলাম।'

'প্রভাসের বিয়ে দেবে! এত তাড়াতাড়ি!' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন প্রতুল সেন।

চন্দ্রবিকাশবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'তাড়াতাড়ি দেখলে কোথায় তুমি? প্রভাসের বয়স তো কম হল না। ঊনত্রিশ পার হচ্ছে।'

একটু থেমে গলা বাড়িয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ধরবাবু আবার বললেন, 'তা তোমার সংবাদ কী? একই বছরে তো জন্ম কল্যাণের। ছেলের বিয়ের কথা ভাবছ না?'

'এতদিন তো ভাবিনি। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে কল্যাণকে বিয়ে করিয়ে দেওয়া উচিত। দেখি, ওর মায়ের সঙ্গে আলাপ করে। ছেলের মতামতও তো নেওয়া দরকার।' বললেন সেনবাবু।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'যা করবে তাড়াতাড়ি কর। শুভস্য শীঘ্রম।'

সেনবাবু বললেন, 'তা প্রভাসের বিয়ে সম্পর্কে কী যেন বলতে এসেছিলে?'

'বলছিলাম কী, প্রভাস আমার একমাত্র ছেলে। তার মায়েরও বয়স হয়েছে। মায়ের বড় সাধ পুত্রবধূ ঘরে আনবে।' বললেন ধরবাবু। একটু ভূমিকা করেই বললেন। এরপর কন্যা ঠিক করার কথা, চৌধুরীবাড়ির প্রসঙ্গ, জীবন চৌধুরীর ঐশ্বর্যের প্রসঙ্গ, কনে অহনা চৌধুরীর কথা বিস্তারিত বললেন। অহনা যে অসাধারণ রূপবতী, মিষ্টভাষী– এসব কথাও বলতে ভুললেন না ধরবাবু। সবশেষে বললেন, 'আগামী পরশু কনে দেখার তারিখ। তুমি আর বউদি না গেলে কনে দেখা অসম্পূর্ণ থাকবে।'

'তোমার ছেলে আর আমার ছেলের মধ্যে পার্থক্য কী? যাব, অবশ্য যাব।' সেনবাবু ধরবাবুকে আশ্বস্ত করলেন।

দুই.

চৌধুরীবাড়ি। বিশাল ড্রইংরুম। এক দিকের সোফায় ধরগিন্নি আর সেনগিন্নি, পাশের সোফায় প্রতুলবাবু আর চন্দ্রবিকাশবাবু। তাঁদের পাশে চন্দ্রবিকাশবাবুর বন্ধু দিলীপবাবু। মুখোমুখি সোফায় চৌধুরীবাবু মানে জীবন চৌধুরী, তাঁর পাশে সহোদর সুকুমার চৌধুরী। তার পাশের সোফায় চৌধুরীগিন্নি এবং অহনা চৌধুরী। একটু দূরে ছোট একটা কাঠের সোফায় বসেছে প্রভাস।

অহনার ঘরে ঢোকা, বসার ভঙ্গি, প্রণাম করার রীতি দেখে সবাই মুগ্ধ। চন্দ্রবিকাশবাবু বলেই ফেললেন, 'অহনা মাকে আমাদের খুব পছন্দ। বেয়াই মশায়ের ইচ্ছে জানলে সামনে আগাতে আপত্তি নেই আমাদের।'

জীবন চৌধুরী সম্মতির হাসি হাসলেন।

সেনগিন্নি বললেন, 'তাহলে ছেলেমেয়েতে একটু কথা বলুক।'

চৌধুরীগিন্নি বললেন, 'তাতে আমাদের আপত্তি নেই। আধুনিক যুগ। ওরা পরস্পরকে জেনে নিক।' তারপর স্বামীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'তুমি ওঁদের চা-নাস্তার তদারক কর। আমি একটু ভেতরবাড়িতে যাচ্ছি।' অহনাকে সোফা থেকে তুললেন তিনি, তারপর প্রভাসকে লক্ষ করে বললেন, 'এস বাবা।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খাবার পর্ব চুকে গেল। সবাই নানা খোশগল্পে মাতলেন। বিয়ের দিনতারিখও ধার্য হয়ে গেল। পৌষের ১৪ তারিখে বিয়ে।

প্রতুল সেনের কী হল কে জানে, হঠাৎ বলে বসলেন, 'ছেলের বিয়েতে কিন্তু সত্তর ইঞ্চির একটা ফ্ল্যাট টিভি দিতে হবে বেয়াই মশাই।'

জীবনবাবু শান্তকণ্ঠে বললেন, 'আমরা সবাই শিক্ষিত মানুষ। মেয়ের বিয়েতে কী কী দিতে হবে জানি।'

'না, বললাম এজন্য যে, অনেক কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে ঠকায়। প্রথমে বলে, হেন দেব তেন দেব। দেওয়ার বেলা অষ্টরম্ভা।' প্রতুলবাবু গলায় একটু উষ্ণতা মিশিয়ে বললেন।

'আমরা সে দলের নই।'

'তারপরও কথাটা হয়ে থাকলে ভালো।'

এসময় ধরবাবু বলে উঠলেন, 'আহ প্রতুল! আমাদের তো কোনো দাবি নেই।'

'আমার আছে।' প্রতুলবাবু বললেন।

এ নিয়ে বড় একটা ফ্যাসাদ হয়ে গেল। এক কথা থেকে অন্য কথা। একটা সময়ে জীবনবাবু বললেন, 'ওঘরে মেয়ে বিয়ে দেব না আমি। আপনারা আসুন।'

জীবনবাবুর ভাই সুকুমার চৌধুরী হই হই করে উঠলেন, 'আরে দাদা, রাগ করছ কেন? বস বস।'

জীবনবাবু ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'প্রতুলবাবু ধরবাবুর আকাঙ্ক্ষার কথাই বলেছেন। ওঁর কথাগুলো নিশ্চয় ধরবাবুর কথা। প্রতুলবাবুর তো কোনো স্বার্থ নেই এখানে। ধরবাবু যা বলতে বলেছেন প্রতুলবাবু তা-ই বলেছেন। ও রকম লোভী পরিবারে আমি মেয়ে বিয়ে দেব না।'

জীবনবাবুর কথা শুনে প্রতুল সেন মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। ধরবাবু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে জীবনবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

বড় একটা বেদনা নিয়ে সবাই বাড়ি ফিরে এলেন।

আলাপের মাঝখানে প্রতুলবাবু হঠাৎ সত্তর ইঞ্চি টিভি দাবি করে বসলেন। টিভির ব্যাপারে ধরপরিবারের কোনো দাবি ছিল না। তারপরও সেনবাবুর টিভির দাবিতে ভীষণ একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল। ধরবাবু বোকা বনে গেলেন। ধরগিন্নিও বেকুফ বনে গেছেন। প্রভাসও এ রকম দাবির কূলকিনারা খুঁজে পেল না। গোটা পরিবারটাই হতভম্ব। সেনবাবুকে এর কারণ জিজ্ঞেস করার রুচি

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হল না ধরবাবুর। যে লোক এই পরিবারের এত নিকটবন্ধু, সে কিনা প্যাঁচ মেরে বিয়েটা ভেঙে দিল!

একদিন, সে মাস তিনেক পরে, প্রতুলবাবুর মারপ্যাঁচের অর্থ খোলসা হয়ে গেল ধরপরিবারের কাছে।

তিনমাস পরে কল্যাণের বিয়ে হল। প্রতুলবাবু ওই অহনা চৌধুরীকেই পুত্রবধূ করে ঘরে আনলেন। প্রভাসের কনে দেখার আসরেই অহনাকে নিজের পুত্রবধূ হিসেবে পছন্দ হয়ে গিয়েছিল প্রতুল সেনের। টিভির প্যাঁচটা দিয়ে বিয়ে ভাঙানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সফলও হয়েছিলেন।

ধরপরিবার স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এতবড় চালাকি! এতবড় বেইমানি! এতদিনের ঘনিষ্ঠ প্রতুল সেন এত বড় মীরজাফর!

দুই বাড়ির সীমানায় দেয়াল উঠল। মুখ দেখাদেখি বন্ধ হল। পাড়ার মানুষের মুখে মুখে এই ঘটনা কিস্‌সার রূপ নিল।

অহনা সংসার করে, সুখের সংসার। কল্যাণ তাকে আদরে-সোহাগে ভরিয়ে রেখেছে। শাশুড়ি বউমা ছাড়া কথা বলে না। প্রতুলবাবু বলেন, 'আমার এক মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে গেছে, বদলে আরেক মেয়ে ঘরে এসেছে। অহনা আমার পুত্রবধূ নয়, মেয়ে।'

তারপরও অহনার ভেতরটা কেন জানি জ্বলে, এক অজানা বেদনা তাকে কুরে কুরে খায়।

দোতলা থেকে ধরবাড়ির সবকিছু দেখা যায়– উঠান, কলতলা, তুলসীর ঝাড়। অহনা চন্দ্রবিকাশবাবুকে দেখে, ধরগিন্নিকে দেখে আর দেখে প্রভাসকে। প্রভাস মাথা নিচু করে ঘরে ঢোকে, মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরোয়। কখনো ওপরদিকে মাথা তোলে না। তুললে দেখত– অহনা নামের এক নারী কী অপরিসীম তৃষ্ণা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

তিন.

স্বয়ংবর সভা। দ্রৌপদী আজ এই সভা থেকে তার স্বামী নির্বাচন করবে। পাঞ্চালরাজের কন্যা দ্রৌপদী। কন্যা বিবাহযোগ্যা হলে স্বয়ংবর সভার আয়োজন করেন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ। দ্রৌপদী শ্যামবর্ণা, পদ্মপলাশলোচনা। কুঞ্চিত কেশকলাপ। নিত্যযৌবনা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রাজা পাঞ্চাল একটি আকাশযন্ত্র এবং একটি প্রায়-দুর্জয় ধনু নির্মাণ করালেন। ঘোষণা দিলেন– যে এই ধনুতে জ্যা যোজনা করে আকাশযন্ত্রের মধ্যদিয়ে লক্ষ্যবস্তু বিদ্ধ করতে পারবে, তাকেই স্বামী হিসেবে বরণ করবে দ্রৌপদী। স্বয়ংবর সভায় নানাদেশের রাজপুত্ররা উপস্থিত হয়েছে। উপস্থিত হয়েছে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের সঙ্গে কর্ণ। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে উপস্থিত আছে পঞ্চপাণ্ডব।

রাজঘোষণার শেষে কর্ণ এগিয়ে এল। কারণ সে বীর, অসাধারণ ধনুর্ধর। দীপ্তিময় দেহ তার। দীর্ঘদেহী। উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল নেত্র। মহাবীর কর্ণ অগ্রসর হয়ে ধনুতে তির যোজনা করে।

কর্ণ সূতপুত্র। একথা কারও অজানা নয়। যতই উপযুক্ত হোক, হীনজাতীয় সূতপুত্রকে তো আর বিয়ে করা যায় না। দ্রৌপদী বলল, 'কর্ণ যতবড় বলবীর্যশালী পুরুষই হোক না কেন, উচ্চবংশে জন্ম নয় তার। সুতরাং কর্ণ ক্ষত্রিয়কন্যার বিবাহযোগ্য পাত্র নয়। কর্ণ লক্ষ্যবস্তু ভেদ করতে সক্ষম হলেও আমি তাকে বিয়ে করব না।'

দ্রৌপদীর কথা শুনে সভার মধ্য হতে উপহাসধ্বনি উঠল। অপমানিত কর্ণ ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল। ভূমিতে সজোরে ধনুটি নিক্ষেপ করে সভাস্থল ত্যাগ করল। তার পর সমস্ত ক্ষত্রিয় একের পর এক অকৃতকার্য হল।

ফাঁপরে পড়ে গেলেন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ। কন্যার স্বয়ংবর সভা বুঝি ভণ্ডুল হতে চলল। নিরুপায় দ্রুপদ ঘোষণা করলেন, 'সভায় উপস্থিত যে কোনোজন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।'

কৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে ছদ্মবেশী অর্জুন লক্ষ্যভেদ করল। দ্রৌপদী তাকে বরমাল্য দিয়ে বরণ করল। কিন্তু সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান সেখানে হল না। দ্রৌপদীকে নিয়ে পঞ্চভ্রাতা মা-কুন্তীর নিকটে উপস্থিত হল। মা তখন গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করছিলেন। গৃহের বাহির থেকে তারা বলল, 'মা, এক অসাধারণ সামগ্রী আমরা ভিক্ষে করে এনেছি। ওটা নিয়ে কী করব এখন?'

ঘরের ভেতর থেকে কুন্তী বললেন, 'তোমরা পাঁচজন মিলে সে জিনিস ভোগ কর।'

এরপর পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ে হল। ভ্রাতৃগণের মধ্যে স্থির হল– দ্রৌপদী এক একজন পাণ্ডবের সঙ্গে এক বছর করে বাস করবে, তখন অন্য ভাইয়েরা দ্রৌপদীর সঙ্গে ভাসুরের মতো আচরণ করবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তারপর তো দ্রৌপদী আর পঞ্চপাণ্ডবের জীবনে কত উথালপাতাল! কত নিগ্রহ, কত নির্যাতন, কত কপটতা, কত দুরভিসন্ধি! এবং সবশেষে যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

কুরুক্ষেত্রের বিপরীত প্রান্তে কৌরব আর পাণ্ডবের তাঁবু পড়েছে। এক প্রান্তে কুরুসৈন্য, দুর্যোধন-দুঃশাসন। অন্যদিকে পাণ্ডবতাঁবু। সৈন্যসামন্ত, কৃষ্ণ, দ্রৌপদী, পঞ্চপাণ্ডব এবং স্বপক্ষের সসৈন্য রাজন্যবর্গ।

সমস্ত দিন রণদামামা। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। হাজার সৈন্যের প্রাণপাত। কৌরবদের প্রথম সেনাপতি ভীষ্ম। দশদিন যুদ্ধ করে শরশয্যা গ্রহণ করলেন তিনি। এর পরের সেনাপতি দ্রোণ। দ্রোণের মৃত্যুর পর যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব পড়ল কর্ণের ওপর। যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণ অপ্রতিরোধ্য। দোর্দণ্ডপ্রতাপে সে গোটা যুদ্ধক্ষেত্র দাপিয়ে বেড়ায়। রথী, মহারথীরা তার সামনে দাঁড়াতে পারে না। অর্জুন ছাড়া অন্যান্য পাণ্ডব কর্ণের হাতে পরাস্ত হচ্ছে বারবার। নিত্যদিনের যুদ্ধক্ষেত্রের যুদ্ধকথা পাণ্ডবশিবির পর্যন্ত পৌঁছে যায়। দিনান্তে শিবিরে পরামর্শসভা বসে। সেখানে কর্ণের শৌর্যবীর্যের কথা আলোচিত হয়। দ্রৌপদীর ভেতরে আলোড়ন ওঠে। কিসের যেন ঝড় বইতে থাকে দ্রৌপদীর হৃদয়ে। এ কিসের মন্থন অনুভব করছে দ্রৌপদী? ভেবে কূল পায় না। কর্ণের বীরত্বগাথা শুনে দ্রৌপদীর খুশি হবার কথা নয়। কিন্তু কেন জানি কর্ণকথা শুনে দ্রৌপদীর উল্লাস বোধ হয়। কেন? কেন?

দ্রৌপদী একা বসে ভাবে– এই কর্ণ তো একদা তার হবার কথা ছিল। স্বয়ংবর সভায় সে তো তার বীর্যবত্তার পরিচয় দিতে উদ্যত হয়েছিল। ও যে সত্যি সত্যি একজন মহাবীর, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে। এ রকম একজন প্রবলপ্রতাপী মানুষ তার স্বামী হলে দোষের কী ছিল? কিন্তু সেদিন তার যে কী হয়েছিল! হীনজাতের দোহাই দিয়ে কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল সে। আর কী আশ্চর্য! সেই হীনজাতের কর্ণের জন্য হৃদয়ে এত তোলপাড় হচ্ছে আজ! আহা, কর্ণকেও যদি স্বামী হিসেবে পাওয়া যেত। পাঁচজনের জায়গায় না হয় ছয়জন হতো। যদি কর্ণকে হৃদয়ের কাছে পাওয়া যেত, পরম তৃপ্তি পাওয়া যেত। এরকম ভাবনা দ্রৌপদীর ভেতরটাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে, আনমনা করে তোলে তাকে। পঞ্চস্বামীর সামনে নিজেকে অতি ক্ষুদ্র মনে হয়। নিজেকে সংযত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে যায় দ্রৌপদী। কিন্তু অবুঝ মন, বিবেকের কথা শোনে না। স্বামীদের সঙ্গে, পুত্রদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে থাকে দ্রৌপদী।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধ একসময় শেষ হয়। পাণ্ডবদের জয় হয়। কিছুদিন রাজ্যশাসনের পর পাণ্ডবরা স্বর্গযাত্রা করে। সঙ্গে যায় দ্রৌপদী।

চার.

অহনা ভেতরে ভেতরে অবিন্যস্ত হতে থাকে। একধরনের বিবর্ণ বিপর্যস্ততা অহনাকে বিধ্বস্ত করতে থাকে। রক্তক্ষরণ হতে থাকে অহনার মস্তিষ্কে, হৃদয়ে।

কল্যাণের সঙ্গে ঘর করছে অহনা। কল্যাণ তাকে গভীরভাবে ভালোবাসে। তার আচরণে-সোহাগে কোনো খামতি নেই। তারপরও অহনার অন্তরে কীসের যেন অভাব। কীসের অভাব, কার অভাব? কে সে? সে কি প্রভাস? তার প্রথমদেখা পুরুষ, প্রথম হাতধরা পুরুষ? সেই বিকেলে একপর্যায়ে হাতটা ধরেছিল প্রভাস। মা এনে তাঁর ঘরে বসিয়ে দিয়েছিলেন দুজনকে। বলেছিলেন, 'তোমরা কথা বল। আমি একটু ওদিকটা সামলাই।' বলে মা সরে গিয়েছিল ঘর থেকে। কী সুন্দর মিষ্টি করে কথা বলেছিল প্রভাস! বলেছিল, 'খুব ধনী নই আমরা, তবে তুমি অসুখে থাকবে না। তোমাকে আজীবন ভালোবেসে যাব আমি।' বলে অহনার ডান হাতটা নিজের দিকে টেনে নিয়েছিল প্রভাস। সেই স্পর্শ, এই এতদিন পরেও অহনার হাতে লেগে আছে। মাঝে মাঝে হাত বোলায় সেই স্পর্শিত অংশে।

কল্যাণ তাকে পরম সুখে রেখেছে। শ্বশুর-শাশুড়ির তুলনা নেই। তারপরও মনের মধ্যে খোঁচাখুঁচি। মাঝেমধ্যে মনে হয়– তার স্বামী কল্যাণ না হয়ে প্রভাস হলেই ভালো হতো। কী দারুণ শান্ত স্বভাব প্রভাসের! কখনো উঁচু গলা শোনা যায় না তার। পাড়াতো ননদিনী বলে, প্রভাসদার তুলনা নেই। পাড়ার সবাই মান্যিগণ্যি করে তাকে। স্বভাবচরিত্র খুবই ভালো প্রভাসদার। কল্যাণও ভালো। তবে অল্পতে রেগে যায়। তখন তার হুঁশ থাকে না। চিৎকার চেঁচামেচি করে। আহা, প্রভাস যদি তার হতো, কতই না ভালো হতো।

পাঁচ.

পরীক্ষিতের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে পাণ্ডবরা মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করে। তারা হিমালয়, বালুকার্ণব, মেরুপর্বত পার হতে থাকে। একদিন পথে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দ্রৌপদী পতিত হয় এবং মৃত্যুবরণ করে। ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করে, 'দ্রৌপদীর অকালমৃত্যুর কারণ কী দাদা?'

যুধিষ্ঠির বলে, 'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর পক্ষপাতিত্ব ছিল। তাছাড়া.....।'

'তাছাড়া কী দাদা?' ভীম আবার জিজ্ঞেস করে।

'কর্ণের প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা পোষণ করত দ্রৌপদী, মনে মনে। এটা অপরাধ। এই অপরাধেও দ্রৌপদীর অকালে মৃত্যু হল।' ধীরস্থির কণ্ঠে বলে গেল যুধিষ্ঠির।

ভীম স্তম্ভিত।

ছয়.

অহনা আসন্নপ্রসবা। গত কদিন ধরে খুব কষ্ট পাচ্ছে। ম্যাটারনিটিতে ভর্তি করানো হয়েছে তাকে। ডাক্তার বলেছেন– ক্রিটিকেল অবস্থা। দুজনকে বাঁচানো যাবে না। মায়ের অবস্থা সন্তানের চেয়ে খারাপ। অহনা মাঝেমধ্যে জ্ঞান হারাচ্ছে।

কল্যাণকে একা পেয়ে অহনা বলল, 'আমি বাঁচব না কল্যাণ। মরার আগে আমি আমার একটা ইচ্ছে পূরণ করতে চাই।'

'কী ইচ্ছে? কী ইচ্ছে তোমার? আমাকে বল।' কল্যাণ উদ্‌গ্রীব কণ্ঠে বলে।

অহনা কঁকানো গলায় বলে, 'আমার বাসনা পূরণ করা তোমার পক্ষে কঠিন হবে।'

প্রবল আগ্রহ নিয়ে কল্যাণ বলে, 'বল তুমি। যত কঠিনই হোক, তোমার ইচ্ছা পূরণ করব আমি।'

অহনা নিশ্চুপ হয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলে না। হয়তো কথা বলার শক্তি ফুরিয়ে গেছে তার অথবা বাসনার কথাটা বলার জন্য শক্তি সঞ্চয় করছে।

এই সময় কল্যাণ অহনার হাত ঝাঁকিয়ে আবার বলে ওঠে, 'অহনা, তুমি আমার স্ত্রী। তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণের দায়িত্ব আমার। বল, তোমার কী বাসনা?'

'আমি মরার আগে প্রভাসকে একনজর দেখতে চাই।' শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে অহনা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুরেন্দ্র গাওয়াল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সবাই তাকে সুরেন্দ্র গাওয়াল নামে চেনে।
তার পদবি গাওয়াল নয়, অধিকারী। তার পেশার কাছে বংশগত পদবি হেরে গেছে। মানুষ তাকে এখন সুরেন্দ্র অধিকারী নামে চেনে না, চেনে সুরেন্দ্র গাওয়াল নামে। সুরেন্দ্র গাছি হিসেবেও কারও কারও কাছে তার পরিচয়। দুটো পদবিরই আলাদা আলাদা ইতিহাস আছে।

জিতেন্দ্রনাথের বাড়ি লাকসামের অজগাঁয়ে। এসএসসিটা করে কুমিল্লা শহরে চলে এসেছিলেন। ঠাকুরপাড়ার কালিঘর গলির এক পুকুরপাড়ের টিনশেডে থাকা শুরু করেছিলেন। নিজ হাতে রাঁধতেন। গোটাদিন এখানে ওখানে চাকরি খুঁজে বেড়াতেন। একটা সময়ে চাকরি পেয়ে গিয়েছিলেন, চান্দিনার হাফিজুদ্দিন কলেজে, প্রভাষকের চাকরি। গণিতের প্রভাষক। চাকরি পেয়েই গলির মুখের বাদাম গাছটায় ইয়াবড় এক সাইনবোর্ড ঝুলালেন। তাতে লেখা– অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, গণিত বিভাগ, চান্দিনা হাফিজুদ্দিন কলেজ, অতি যত্নসহকারে গণিত পড়ানো হয়।

তার পর প্রাইভেট-ছাত্রছাত্রীদের ঢল নেমেছিল জিতেন্দ্রস্যারের টিনশেডে। রমরমা অবস্থা অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথের। চাকরির সময়টুকু ছাড়া রাত এগারোটা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী নিয়ে পড়ে থাকলেন। একদিন পুকুরপাড়ের আটশতক জায়গা কিনে নিলেন। বিয়েটা করে ফেললেন এক ফাঁকে। কেনা জায়গায় চারতলার ফাউন্ডেশন দিলেন। একদিন দোতলা বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়াল ওই জায়গায়। বাড়িটার সামনে মাঝারি সাইজের উঠান। উঠানে আম, কাঁঠাল, জাম, নারকেল গাছ। তো ওই জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ঘরেই জন্মেছি আমি। একমাত্র সন্তান।

আমি তখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি, ভিক্টোরিয়া কলেজে। একদিন ক্লাসে স্বপ্না ম্যাডাম 'হৈমন্তী' গল্পটি পড়াচ্ছিলেন। ক্লাসভর্তি ছাত্রছাত্রী হাঁ-করে শুনছিল। গভীর মনোযোগে তাকিয়েও দেখছিল কেউ কেউ। ইঁচড়েপাকা দুষ্টুরা বলত– ম্যাডামের কথা শুনতে যেমন মজা, তার দিকে তাকিয়ে থাকতেও তেমন মজা। স্বপ্না চৌধুরী অসাধারণ রূপসী ছিলেন। সেদিন ছিল 'হৈমন্তী' বিষয়ে শেষ ক্লাস। ম্যাডাম বলেছিলেন, 'বাল্যবিয়ের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল। এ ধরনের বিয়ে সম্পর্কে তাঁর প্রচণ্ড ঘৃণা ছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাল্যবিয়ের পরিণতি যে কত বেদনাদায়ক, তা-ই এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন।'

'কতাডা ঠিক না ম্যাডাম।' আমার পাশ থেকে কে যেন বলে উঠেছিল। চকিতে তার দিকে তাকিয়েছিলাম। আরে, এ যে ভোলানাথ! এ মাসের প্রথমদিকে হাসানপুর কলেজ থেকে ট্রান্সফার নিয়ে এসেছে। জামাকাপড়ে গেঁয়ো ঢং। মাঝারি সাইজের ভোলানাথের শরীরটা বেঢপ। একটু কুঁজো সে। পেটটা স্বাভাবিকের চেয়ে বড়। ব্যাকব্রাশ করা চুল। চুপচাপ ধরনের। শহরের স্মার্ট ছেলেরা তাকে হাবাগোবাই বলবে। হাবাগোবা ধরনের ভোলানাথ ম্যাডামের কথার প্রতিবাদ করায় ক্লাসের সবাই চমকে তার দিকে তাকিয়েছিল। সবচাইতে বেশি অবাক হয়েছিলেন স্বপ্না ম্যাডাম। বিস্ময় কেটে গেলে তিনি বিচলিত বোধ করছিলেন।

বিব্রত গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কোন কথাটা ঠিক নয়?'

'আফনে কইলেন রবীন্দ্রনাথ বাল্যবিয়ে পছন্দ করতেন না, হেই কতা ঠিক না।' দাঁড়িয়ে খাস কুমিল্লার টানে ভোলানাথ বলেছিল। আস্থার কণ্ঠ তার।

ম্যাডামের চোখের মণি কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার মতো অবস্থা। কয়েক মুহূর্ত ভোলানাথের দিকে তাকিয়ে থেকেছিলেন তিনি। এই সময়ের মধ্যে তিনি ভেতরটা গুছিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর শান্তস্বরে বলেছিলেন, 'আমি যতদূর জানি, মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল। সেই আপত্তির ফলশ্রুতিতে হৈমন্তী গল্প লেখা।'

'তাইলে চইদ্য বছর পুরানর আগে মাধুরীলতারে আর মাত্র সাড়ে দশ বছর বয়সে দ্বিতীয় কইন্যা রেণুকারে বিয়া দিলেন কেন রবীন্দ্রনাথ?' ভোলানাথ দৃঢ় কণ্ঠে বলল।

ম্যাডাম একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। তাই তো, ছেলেটির কথা তো মিথ্যে নয়। হঠাৎ আনিস স্যারের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। আনিসুজ্জামান স্যার রবীন্দ্রনাথ পড়াতেন। একদিন ক্লাসে এসেই তিনি বলেছিলেন, 'আজকে আমার আলোচনার বিষয় রবীন্দ্রজীবনে অসহায়তা।' রবীন্দ্রজীবনের নানা বেদনা আর অসহায়তার কথা বলেছিলেন স্যার সেদিন। একসময় রবীন্দ্রকন্যাদের কথাও তুলেছিলেন তিনি। বিয়ের খরচের কথা চিন্তা করে অনেকটা নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই অল্প বয়সে কন্যাদের বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কথা শেষ করবার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আগে আনিস স্যার বলেছিলেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু অসামঞ্জস্য থাকে। কন্যাদের বাল্যবিয়েটাও তাঁর জীবনের একটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাপার।

স্টেজে দাঁড়িয়ে বিব্রতমুখে ভোলানাথের দিকে তাকিয়ে থাকলেন স্বপ্না ম্যাডাম। একটা ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে রবীন্দ্রনাথের এই কনট্র্যাডিকশন বিষয়ে আলোচনা করা যায়। বলা যায়– রবীন্দ্রনাথের নিজ জীবনে যা-ই হোক, তাঁর প্রকৃত ভাবনা ছিল বাল্যবিয়ের বিপক্ষে। কিন্তু সেই মুহূর্তে ব্যাপারটি নিয়ে আর কথা বলতে ইচ্ছে করেনি ম্যাডামের। শুধু মৃদু কণ্ঠে বলেছিলেন, 'তোমার কথা ঠিক। রবীন্দ্রনাথ আপন আদর্শের সঙ্গে সাংসারিক জটিলতার কারণে কর্মের সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারেননি।'

সেই থেকে ভোলানাথের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। ঘনিষ্ঠতা থেকে বন্ধুত্ব। ভোলানাথও আমার মতো একজনকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে বর্তে গেল। রানীর দীঘির পাড়ে গান্ধী অভয়াশ্রমে থাকত ভোলানাথ। সহজ সরল আর অতি সাধারণ মানের পোশাক পরত বলে সহপাঠীরা তার সঙ্গে তেমন করে মিশত না। এজন্য ভোলানাথের মধ্যে হা-হুঁতাশ ছিল না। কলেজের গোটাটা সময় সে আমার সঙ্গেই কাটাত। বাকি সময় কাটাত রামমালা পাঠাগারে। বলতে গেলে, রোববার বন্ধের দিন ছাড়া, বিকেল থেকে সন্ধে পর্যন্ত অধ্যয়নেই কাটত তার। ওই বয়সে বঙ্কিম উপন্যাস, শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত, রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস, শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাস, গান্ধীর আত্মজীবনী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিষয়ক প্রবন্ধাদি পড়ে ফেলেছে সে। সবটা যে সে বুঝত, এমন নয়। একদিন জিজ্ঞেস করলে বলল, 'সবকিছু বুঝি না, কিছু কিছু বুঝি। পড়তে ভালো লাগে বলে পড়ি। কোথাও যাওয়ার নাই বলে পড়ি।'

ভোলানাথকে মাঝেমধ্যে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসতাম। আমাদের দোতলা বাড়ির ঘরগুলো বেশ বড় বড়। দক্ষিণমুখী। দোতলার যে ঘরটিতে আমি থাকতাম, সে ঘরে গল গল করে দক্ষিণের বাতাস ঢুকত। ফ্লোরটা শীতল হয়ে থাকত। ঘরে ঢুকেই জামা খুলে ফেলত ভোলানাথ। ফ্লোরে চিৎ হয়ে সটান শুয়ে পড়ত। বলতাম, 'করস কী, করস কী ভোলানাথ? ফ্লোরে শুয়ে পড়লি যে!'

ভোলানাথ বলত, 'আশ্রমে বেশি গরম। ঘুমাইতে পারি না। এই দেখস না সারা গায়ে ঘামাচি। ঠাণ্ডায় শুইতে আরাম লাগে।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মা খুব ভালোবাসত ভোলানাথকে। আমাদের বাড়িতে এলে এটা ওটা খেতে দিত। ভাত খাওয়ার সময় এলে না খাইয়ে ছাড়ত না মা। যত্ন করে খেত ভোলানাথ। তার পাশে খেতে বসে নিজেকে বড় অগোছালো মনে হতো। গাছগাছড়া খুব পছন্দ করত সে। আমাদের উঠানের আম-জাম-কাঁঠাল গাছের সঙ্গে গভীর সখ্য গড়ে উঠেছিল ভোলানাথের।

বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করলে কিছুই বলতে চাইত না। বেশি চাপাচাপি করলে বলত, 'এই আর কী, গেরামের সাধারণ একজন মানুষ আমার বাবা। সাধারণ মানুষের যেরকম ঘরবাড়ি থাকে, সেরকমই ঘরবাড়ি আমাদের।' বলে চুপ মেরে যেত। মা-বাবা-ভাইবোন– এঁদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে চাইত না।

ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি তখন, একদিন হঠাৎ করে ভোলানাথ আমাকে বলল, 'যাবি তুই আমার লগে? আমাদের বাড়িতে? দু'চারদিন থাকবি। তবে তোদের বাড়ির মতো আরামে রাখতে পারব না তোরে।' একনাগাড়ে কথাগুলো বলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ভোলানাথ। কলেজে কী একটা বন্ধ চলছে তখন।

মা এককথায় রাজি হয়ে গেল। বলল, 'ভোলা তো নিজের ছেলের মতন। তাছাড়া গ্রাম তো তোর ভালো করে দেখা হয়নি। যা, গিয়ে কদিন বেড়িয়ে আয়।'

বাবার অনুমতি পেতে কষ্ট হয়েছিল। ভোলানাথকে ভালো করে চিনতেন না বাবা। ছেলের সঙ্গে বাড়িতে আসা যাওয়া করছে, এইটুকু পর্যন্ত জানেন শুধু। বাবা বলেছিলেন, 'অচেনা একজনের সঙ্গে ছেলেকে ছেড়ে দিতে চাইছ? কোন অজানা গ্রামে নিয়ে যাবে।'

মা বলেছিল, 'ভোলা বড় ভালো ছেলে। দাউদকান্দির ওদিকে, কেষ্টপুর না বিষ্ণুপুর গাঁয়ে তার বাড়ি। কদিন বেড়াতে যেতে চাইছে, যাক না।'

কলেজে রওনা দিতে দিতে বাবা বলেছিলেন, 'যা ভালো বোঝ কর। কোনো ঝুটঝামেলায় আমাকে যাতে জড়াতে না হয়। আজ কলেজে মিটিং, আর দাঁড়াতে পারছি না আমি।' বাবা তখন চান্দিনা হাফিজুদ্দিন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল।

ভোলানাথের গ্রামের বাড়িতে এসে আমার চোখ ছানাবড়া। 'কীরে ভোলানাথ, তুমি বলেছিলে তোমার বাবা সাধারণ একজন মানুষ, এ যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেখছি.....।' কখনো তুই, কখনো তুমি সম্বোধন করতাম ভোলানাথকে। সেও।

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভোলানাথ বলল, 'কোথায় কুমিল্লা শহরে তোদের দোতলা বিল্ডিং, আর কোথায় আমাদের মাটির ঘর।'

ভোলানাথদের মাটির ঘর বটে, কিন্তু দোতলা। দাউদকান্দির এসব গাঁয়ে বনেদি পরিবারেই শুধু এরকম দোতলা মেটেবাড়ি থাকে। মাটির পুরু দেয়াল, বড় বড় জানালা। খাপরার ছাউনি। ভোলানাথদের বাড়িটি বিশাল। সামনে প্রকাণ্ড উঠান। উঠান পেরিয়ে পুকুর। পুকুর তো নয়, যেন ছোটোখাটো একটা দীঘি। পুকুরের চারদিকে নানা জাতের গাছ। টানা উঠানের ধারে ধারে কাঁঠালচাঁপা, কামিনী, শিউলি ফুলের গাছ। উঠানের একদিকে ধানের বিশাল গোলা। এসব দেখে আমার তো ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা। দোতলায় ভোলানাথের থাকার ঘরটি সাজানো গোছানো। বিরাট খাট। ওখাটেই আমার থাকার ব্যবস্থা। পাশের ছোট্ট খাটে ভোলানাথ থাকবে।

বিকেলে ভোলানাথের বাবার সঙ্গে দেখা হল। ছেলের বন্ধু জেনে বুকে টেনে নিলেন। হাঁটুনামা ধুতি, গায়ে ফিনফিনে কাপড়ের ফতুয়া। চেহারা বনেদি। ভোলানাথের চেহারা ঠিক তাঁর উল্টো। এখানে এসেই জানলাম– ভোলানাথ তার বাপের একমাত্র সন্তান। আরও জানলাম– বাড়ি থেকে অনায়াসে হাসানপুর কলেজে পড়তে পারত সে। কিন্তু কোন এক গভীর দুঃখে সে ভিক্টোরিয়া কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়েছে। প্রথম প্রথম বুঝতে পারিনি, শেষে শেষে যখন একটু আধটু আন্দাজ করলাম, জিজ্ঞেস করলে নিশ্চুপ থেকেছে ভোলানাথ। বাপের কথা দু' এক টুকরো বললেও, মায়ের ব্যাপারে কোনো কথাই বলত না ভোলানাথ।

দুপুরে খেতে বসে তার মাকে প্রথম দেখলাম আমি। বয়সে বাপের তুলনায় বেশ নবীন বলেই মনে হল আমার। ভোলানাথ তো আমার বয়সি। তার মায়ের বয়সও তো আমার মায়ের মতো হওয়া উচিত। কিন্তু তার মায়ের বয়স যে অনেক কম। আমার ভাবনাকে আপাতত আমার মধ্যে চেপে রাখলাম।

ভোলানাথের মা বড় যত্ন করে খাওয়ালেন আমাদের। রুই মাছের মাথাটা খাওয়ার জন্য খুব সাধাসাধি করলেন ভোলানাথকে। মুখে কিছু না বলে হাত ইশারায় মাথাটা পাতে না দেওয়ার জন্য ইঙ্গিত করল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভোলানাথ। খেতে খেতে আমি অবাক হয়ে তাদের কাণ্ডকারখানা দেখে গেলাম।

রাতে পাশাপাশি খাটে শুয়ে ভোলানাথকে চেপে ধরলাম, 'ব্যাপার কী ভোলানাথ? তুই কি তোর মায়ের সঙ্গে কথা বলিস না নাকি?'

ভোলানাথ কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকল, আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না।

আমি আবার বললাম, 'কিছু বলছিস না যে!'

'মাইয়ালোকডা আমার মা না, কাজের বেটি।' অনেকটা স্বগতকণ্ঠে বলল ভোলানাথ।

'মানে!' আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

'বিয়ের দিন মার লগে লউগ্যাঢুরি আইছিল, নয় দশ বছরের নাক বোঁচা মেয়ে। মায়ের বাপের পাড়ার গরিব ঘরের মাইয়া। থেকেই গেছিল আমাগো বাড়িতে। আমার যখন বারো বছর বয়স মা মারা গেল। মাইয়াডা তখন মাইয়া নাই বড় হইয়া গেছে। আমারে লালনপালন করল। আমার এসএসসি পাসের আগে আগে হঠাৎ ওই মহিলারে বিয়া কইরা বসল আমার বাপ। কুমিল্লা শহরে বনবাসে গেলাম আমি। এই আমার ইতিহাস।' ধীরে ধীরে বলে গেল ভোলানাথ।

'তোকে তো বেশ আদরযত্ন করছেন দেখলাম।'

ভোলানাথ বলল, 'মনে অপরাধবোধ আছে না। আমার মার জায়গা দখল করে নিছে সে।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ভোলানাথ।

কিছুক্ষণ থেমে আপন মনে আবার বলতে শুরু করল, 'আমার কষ্টটা বাপে যখন টের পাইল, কুঁকড়ে গেল। সাবধানে আমার লগে কথা বলতে লাগল। যতটুকু সম্ভব দূরে দূরে থাকল। মহিলাডাও ভয়ে ভয়ে থাকে।'

'তাঁর কোনো বাচ্চাকাচ্চা?' জিজ্ঞেস করলাম।

ভোলানাথ বলল, 'না, কোনো সন্তান অয় নাই মহিলার। এই জন্য তার আফসোস নাই বোধ হয়। আমি বাড়িতে আইলে খুব খুশি হয়।'

'ক্ষমা করে দিতে পারিস না?'

'থাক ওসব কথা। কাইল তোরে একজনের কাছে লইয়া যামু। সুরেন্দ্রকাকা। ভালো লাগবে তোর।' ভোলানাথ প্রসঙ্গান্তরে গেল।

ওই রাতে আর কথা হল না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরদিন সন্ধের দিকে ভোলানাথ আমাকে সুরেন্দ্রকাকার বাড়িতে নিয়ে গেল। বাড়ি মানে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে থাকা দু'কামরার দীন একটা দোচালা ঘর। ছনের ছাউনি। ঘরের বেড়া এখানে ওখানে ভেঙে গেছে। দু'কদম দূরে নুইয়ে-পড়া একটা পাকঘর। চার-পাঁচজন বসতে পারার মতো একটা দাওয়া। দাওয়া-লাগোয়া এক চিলতে উঠান। আমরা যখন পৌঁছালাম, সুরেন্দ্রকাকা তখন কী যেন একটা বই সুর করে পড়ছে। জনা তিনেক মানুষ খুব মনোযোগে তার পাঠ শুনছে। সামনে কেরোসিনের একটা চেরাগ জ্বলছে। নিকটে একটা ধূপকাঠি আপন মনে জ্বলে জ্বলে নিজের জীবন ফুরাচ্ছে।

সুরেন্দ্রকাকার নিকটে গিয়ে ভোলানাথ টুপ করে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বসল। আমি বেকায়দায় পড়ে গেলাম। অগত্যা আমাকেও একই কায়দায় প্রণাম করতে হল। খুব যে ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে প্রণাম করলাম, এমন নয়। আমার অহংকারী মন বলল, খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা জীর্ণদশার এই লোকটিকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করার কী আছে? পরনে বিবর্ণ একটা ধুতি, উদোম গা। চুল এলোমেলো। দেখলে বোঝা যায়, নিজেকে আকর্ষণীয় দেখাবার জন্য এই লোকটি বহুদিন মাথায় চিরুনির আঁচড় দেয়নি। চোখ কোটরাগত। কপালে বলিরেখা। সেই বলিরেখাগুলো দারিদ্র্যের জন্য, না অধিক বয়সের জন্য প্রথম দেখায় তাৎক্ষণিক বুঝতে পারলাম না।

ভোলানাথকে দেখে সুরেন্দ্রকাকার পোড়া চোখ খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠল। বলল, 'আরে, আমাদের ভোলা যে! বস বস বাবা।' বিছানো ভাঙা পাটিটি দেখিয়ে বলল সুরেন্দ্রকাকা। তার পর আমার দিকে মুখ ফেরাল। চোখ বলল, এ কে?

ভোলানাথ বুঝতে পেরে বলল, 'ও আমার বন্ধু। কুমিল্লার ঠাকুরপাড়ায় থাকে। বাওনের পোলা কিন্তু।' বলেই সকৌতুকে আমার দিকে তাকাল ভোলানাথ।

শুনেই গ্রন্থপাঠ ছেড়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সুরেন্দ্রকাকা। সন্ত্রস্ত গলায় বলল, 'একী করলে বাবা তুমি? বাওনের পোলা হইয়া গাওয়ালরে প্রণাম করলা?' অপরাধবোধে সুরেন্দ্রকাকার চোখের মণি বেরিয়ে আসতে চাইল।

আমি মিষ্টি হেসে বললাম, 'আপনি ভোলার কাকা। ও প্রণাম করল আপনাকে, আমিও করলাম। এতে কোনো পাপ নেই।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার কথা সুরেন্দ্রকাকা মেনে নিলেন বলে মনে হল না। বসতে বসতে বলল, 'আমারে তুমি করে বললে খুশি হব বাবা। ভোলাও তাই বলে।'

সেদিন আর গ্রন্থপাঠ হল না। শ্রোতারা বিদায় নিল। আমাদের নিয়ে নানা কথায় মশগুল হয়ে পড়ল কাকা। এক ফাঁকে কাকিমা মুড়িমোয়া দিয়ে গেল।

ফিরে আসতে আসতে ভোলানাথ জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখলে সুরেন্দ্রকাকাকে?'

আমি বললাম, 'প্রথম দেখায় মানুষকে কি পুরোপুরি বোঝা যায়? তবে সহজ-সরল অমায়িক মানুষ বলে মনে হল।'

'বড় দুখী মানুষ এই সুরেন্দ্রকাকা।' বলল ভোলানাথ।

তার পর যা বলে গেল তার সারমর্ম এই রকম। কেষ্টপুর গাঁয়ের এ এলাকাটায় বড় বেশি গরিব মানুষের বসবাস। তার বাবার মতো দশবিশটা পরিবার অধিকাংশ জায়গাজমির মালিক। চাষের সময় গরিবরা ধনী গৃহস্থদের খেতেখামারে কামলা খাটে। চাষের সময় ফুরালে তারা বেকার। সুরেন্দ্রকাকা গরিব হয়েও কামলাগিরিতে গেল না। জীবনটাকে ভিন্ন ধাঁচে দাঁড় করাল। কেষ্টপুরে প্রচুর খেজুর আর নারকেল গাছ। ছোটবেলায় কাকা দস্যুমতন ছিল। যেকোনো গাছে তরতর করে উঠে যেতে পারত। মধ্যবয়সেও গাছবাওয়ার দক্ষতা ঘুচে যায়নি সুরেন্দ্রকাকার। শীতকালে মানুষের কাছ থেকে খেজুর গাছ লিজ নিতে শুরু করল। অগ্রহায়ণ থেকে খেজুর গাছ কাটা শুরু করে কাকা। পৌষের শুরুতে গাছ থেকে খেজুর রস সংগ্রহ করে। বাড়িতে বাড়িতে বিক্রি করে দু'পয়সা আয় হয় কাকার। কোনো কোনো রাতে রস চুরি হয়ে যায়। তখন কাকা টর্চ হাতে এগাছের গোড়া থেকে ওগাছের গোড়ায় হেঁটে রাত কাবার করে। মাঝে মাঝে পাড়াপড়শির নারকেল গাছও ছিলে দেয় কাকা। সেখানেও দু'চার দশটাকা আয় হয়। তো ওই থেকে সুরেন্দ্রকাকার নাম হয়ে গেল সুরেন্দ্র গাছি।

সুরেন্দ্র গাছির ঘরে ছেলে এল, মেয়ে এল। খেজুর রস বেচে, নারকেল গাছ ছিলে সংসার আর চলে না। তখন এক বুদ্ধি বার করল সুরেন্দ্র গাছি। গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় পান-সুপারি বেচা শুরু করল। কুমিল্লার এ অঞ্চলে যারা পান-সুপারি বিক্রি করে, তাদের গাওয়াল বলে। সুরেন্দ্রকাকা সুরেন্দ্র গাছি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

থেকে সুরেন্দ্র গাওয়াল হয়ে গেল। গাওয়ালগিরি করতে প্রথম প্রথম খুব শরম করত সুরেন্দ্র কাকার। বউ বলত– যেখানে ভাত, সেখানে জাত। পান-সুপারি বিক্রি করে তার সংসারের অভাব কিছুটা মিটল।

গঞ্জের হাট থেকে পাইকারি দরে পান-সুপারি কিনে পাড়ায়-হাটে বিক্রি করে কাকা। ঝাঁকায় পান-সুপারি ভরে সকালের দিকে বের হয়ে যায়। ফিরতে ফিরতে ঠিকদুপুর। কোনো কোনো দিন সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ে। দুপুরে খেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। বিকেলে ধারালো দাওটা আর কাছিটা নিয়ে বের হয়, যদি কোনো পরিবার নারকেল গাছটা, সুপারি গাছটা ছিলায়।

সন্ধেটা একেবারে নিজের মতো করে উপভোগ করে সুরেন্দ্র গাওয়াল। কাশীরাম দাসের 'মহাভারত'টা তার খুব প্রিয়। সুখে এবং বেদনায় 'মহাভারত'ই তার একমাত্র অবলম্বন। প্রতি সন্ধ্যায় নিয়ম করে 'মহাভারত' পড়ে সুরেন্দ্র গাওয়াল। কোনো কোনো সন্ধ্যায় পড়শিদের কেউ কেউ শুনতে আসে। তখন কিছুটা পড়ে পড়ে তার ব্যাখ্যা শোনায় শ্রোতাদের। নিজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে সে, সে ব্যাখ্যায় জাগতিক মানবজীবনের সুখ-দুঃখ-বেদনা-প্রাপ্তির কথা মিশে থাকে। বলে, "ভেজাইল্যা মানুষ যে শুধু এই যুগে আছে এমন নয়, 'মহাভারতে'র যুগেও ছিল। যেমন ধর শকুনি মামা। দুর্যোধনদের আপন মামা ছিল সে। মামারা তো ভাগ্নেদের মঙ্গলই চায়, কিন্তু শকুনি মঙ্গল চাইল না। বরং ভাগ্নেদের মনে রাজ্যলোভ ঢুকিয়ে দিল। জুয়া খেলা মানে পাশা খেলায় আসক্ত করল তাদেরকে। এই জন্যই না কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধল। আমাদের আত্মীয়দের মধ্যেও খেয়াল কর, শকুনি মামার মতো আত্মীয় আছে। এরা আমাদের মঙ্গল চায় না। আত্মীয়ের ছদ্মবেশে খুব ক্ষতি করে আমাদের। আর দুর্যোধন-দুঃশাসনের মতো সন্তান কি নেই আমাদের? আছে। এই সন্তানরা মা-বাপের কথা শুনে না। কারণে-অকারণে মা-বাপকে অপমান করে।" বলে হঠাৎ চুপ মেরে যায় সুরেন্দ্র গাওয়াল। তার একমাত্র ছেলেটি তার কথা শোনে না। কুসঙ্গে মিশে মিশে এক্কেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। এইজন্য সুরেন্দ্র গাওয়ালের দুঃখের অবধি নেই।

দ্বিতীয় দিন গিয়ে কাকার ছেলেটির দেখা পেলাম আমরা, নাটকীয়ভাবে। সেদিন জানতে পারলাম কাকা তার ছেলেটাকে বিয়েও করিয়েছে, আট মাসের একটা নাতিও আছে কাকার ঘরে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভোলানাথ বলেছিল, 'চল যাই কাকার কাছে। পরশু গিয়ে তো তেমন করে কথাবার্তা বলতে পারিনি। আজ যাই চল, কিছুডা সময় কাডাই আসি তার লগে।'

কাকা আমাদের দেখে, সেই সন্ধ্যায়, খুব তৃপ্তি পেয়েছিল। সে সন্ধ্যায় শ্রোতার সংখ্যা একটু বেশি ছিল, সাত-আটজন। কাকা পড়ছিল 'শান্তিপর্ব্বে'র ইন্দ্রের শাপমোচন অংশটি। আমরা গিয়ে পাটিতে বসে পড়েছিলাম। কাকা স্মিতমুখে আমাদের দিকে এক পলক তাকিয়ে পড়ায় মন দিয়েছিল। সুরেন্দ্রকাকা পড়ছিল—

সহস্র যোনিতে ইদ্র পীড়িত শরীরে।
বসিতে না পারে সেই দেবের ভিতরে॥
মহাপীড়া কামজ্বরে করয়ে রোদন।
কে আছে আমার দুঃখ করিতে মোচন॥
দেবগুরু বৃহস্পতি কহিলা তাহারে।
আমার বচন তুমি শুন পুরন্দরে॥
যেখানে পতন হই সেইখানে উঠি।
তাহারে সন্তোষ করি যার স্থানে ঘাটি॥

সবাই মনোযোগ দিয়ে কাকার পাঠ শুনে যাচ্ছিল। সুমধুর কণ্ঠ কাকার। তার কোমল কণ্ঠ চারপাশে একটা স্নিগ্ধ বাতাবরণ তৈরি করে চলেছে। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা শব্দ হল। বড় একটা ইটের টুকরা উঠানে আছড়ে পড়ল। একটা রুক্ষ কর্কশ মাতাল কণ্ঠ ভেসে এল সবার কানে, 'কিয়ের চেঁডের বালের পড়া। ঘরডারে পাঠশালা বানাইছ? বয়স্ক ইস্কুল? হালার পুতদেরও কোনো কাম নাই, প্রতি সইন্ধ্যায় আইস্যা এইখানে জড়ো হয়। ওই বাইনচোদরা, গেলি।'

কাকা শরমে মরে গেল। সব শ্রোতা পালিয়ে বাঁচল। ভাঙাপাটিতে বসে থাকলাম শুধু আমরা দু'জন, আমি আর ভোলানাথ। অধোবদন কাকার। দু'চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। অনেকক্ষণ কাঁদল কাকা। তারপর জলভরা চোখে আমাদের দিকে তাকাল। কান্না জড়ানো গলায় বলল, 'আমার পোলা সুরঞ্জন। লেখাপড়া করছিল কিছুদূর। কুসঙ্গে মিশে উচ্ছন্নে গেল। মানুষে বলল–বিয়া করাই দাও, ভালো হয়ে যাইব। হল না। গাঁজা-মদ-ভাঙে ডুবে গেল। মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে, গালিগালাজ করে, বউ পিডায়।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তারপর একটু থামল সুরেন্দ্রকাকা। অনেকটা স্বগত কণ্ঠে বলল, 'আমার 'মহাভারত'পাঠ একদম পছন্দ করে না সুরঞ্জন।'

সেবেলা কথা আর জমেনি। আমি আর ভোলা উঠে এসেছিলাম। আসার সময় কাকা এমন একটা হাসি হেসেছিল, যা এই ষাট বছর বয়সেও আমি ভুলতে পারিনি।

এরপর অনেকটা বছর কেটে গেছে। পড়াশোনা শেষ করে ভোলানাথ কেষ্টপুরেই ফিরে গেছে। বাবার ক্ষয়রোগ হয়েছে। বিশাল সম্পত্তি দেখার কেউ নেই। ভোলানাথকেই হাল ধরতে হয়েছে। বিয়ে করে বউ সন্তান, মা-বাবা নিয়ে সুখেই দিন কাটছে তার।

আমিও পড়ালেখা শেষ করে বাবার পেশাকে গ্রহণ করেছি। তবে আমি সরকারি কলেজের অধ্যাপক হয়েছি। বাবা মারা গেছেন। মা পুত্রবধূ, নাতিনাতনি নিয়ে মশগুল। একদিন ভোলানাথের একটা চিঠি পেলাম। সংক্ষিপ্ত চিঠি। লিখেছে– আমার মা মারা গেছে এক মাস হতে চলল। আগামী বুধবার মায়ের শ্রাদ্ধ। তুমি এলে খুব খুশি হব।

বি.দ্র. দিয়ে লেখা, বউদি আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে এলে ভীষণ আনন্দিত হব। আর যদি আনতে না-ই পারিস, তুই অবশ্যই আসবি।

ছোট চিঠি কিন্তু আবদার আর ভালোবাসায় জড়ানো। বিস্ময়ও আছে এই চিঠিতে। যে সৎমাকে ভোলা সহ্য করতে পারত না, যাকে মায়ের মর্যাদা দিয়ে 'মা' বলে সম্বোধন করত না, তাকে মা বলে সম্বোধন! তার ওপর আবার শ্রাদ্ধ-শান্তি! ভোলানাথের এই পরিবর্তন দেখে খুবই ভালো লাগল আমার। রূপান্তরিত ভোলানাথকে দেখবার জন্য মনটা আইঢাই করতে লাগল।

যথাদিনে উপস্থিত হলাম কেষ্টপুরে, ভোলানাথের বাড়িতে। সে আমাকে পেয়ে ভীষণ খুশি হল। প্রথমদিন খুব ব্যতিব্যস্ততার মধ্যে কাটল। বিপুলাকারে শ্রাদ্ধ হল, গ্রামের শত শত মানুষকে খাওয়ানো হল। ভীষণ ধকল গেল ভোলানাথের ওপর দিয়ে। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় বলল, 'চল, তোরে এক জায়গায় লইয়া যাই।'

আমি বিজ্ঞের হাসি হেসে বললাম, 'সুরেন্দ্রকাকার বাড়িতে তো?'

ও বলল, 'হ।'

আমি বললাম, 'চল যাই। কাকাকে দেখে আসি।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভোলানাথ ম্লান মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাকা তো বহু বছর আগে মারা গেছে।'

'মারা গেছে!' ব্যথাতুর গলায় বললাম আমি। তারপর বললাম, 'কাকা নাই, গিয়ে লাভ কী?'

ভোলানাথ তেমন কিছু বলল না। শুধু বলল, 'চল না যাই।'

বহু বছর আগের প্রথম সন্ধ্যার মতো ধীর পায়ে সুরেন্দ্র গাওয়ালের উঠানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দূর থেকে দেখলাম– দাওয়ায় বসে কে যেন কী একটা সুর করে পড়ছে। তার সামনে গালে হাত দিয়ে সদ্য এক তরুণ অতি মনোযোগে গ্রন্থপাঠ শুনছে।

কাছে গিয়ে দেখলাম– সুরঞ্জন তার বাবার মতো সুর করে 'মহাভারত' পড়ে যাচ্ছে। আর তার সামনে বসে তারই পুত্র চিবুকে বাম হাত রেখে গভীর মনোযোগে 'মহাভারত'পাঠ শুনে যাচ্ছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তুমি কে হে বাপু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'তুমি কে হে বাপু, সুখনিদ্রায় বিঘ্ন ঘটাতে এলে?' বেদব্যাস জিজ্ঞেস করলেন।

'অপরাধ মার্জনা করবেন। আপনার সঙ্গে দেখা করা আমার ভীষণ প্রয়োজন। আবেগ প্রবল বলে সময়জ্ঞান বর্জিত হয়েছি।'

'তা যাক, তোমার পরিচয় জানতে চেয়েছি, বলনি।'

'আজ্ঞে, আমার নাম অদ্বৈত, অদ্বৈত মল্লবর্মণ।'

'মল্লবর্মণ! অদ্বৈত বুঝলাম, মল্লবর্মণ বুঝতে পারছি না।' বিস্মিত কণ্ঠ ব্যাসদেবের।

'আজ্ঞে, এ আমার বংশধারার পদবি। আমার বংশজ্ঞাপক নাম এটি।'

'বংশজ্ঞাপক নামাংশও আছে নাকি এখন পৃথিবীতে। কই আমার সময়ে তো এসব ছিল না!'

'আপনার সময়ে একটা যুগ গেছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর– এ তিন যুগের সমাজচেহারা প্রায় এক রকম ছিল।'

'আর এখন?'

'এখন কলিযুগ। মানুষের আসল নামের সঙ্গে পদবি জুড়তে হয়। ওই পদবিতেই যত মানমর্যাদা। এখন পৃথিবীতে মানুষের মর্যাদা তেমন নয়, যত না পদবিতে।

"অদ্বৈত, তোমার কথা ভালো করে বুঝতে পারছি না আমি। আমার কালে কারও তো পদবি ছিল না। দ্রোণ, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর, গান্ধারী, সত্যবতী– কারও নামের শেষে কোনো বংশজ্ঞাপক পদবি তো ছিল না! আর আমিও তো ব্যবহার করিনি। শুধু আমি কেন, ত্রেতা যুগের মহান কবি বাল্মীকি, তিনিও তো 'রামায়ণে' কারও নামের শেষে পদবির উল্লেখ করেননি। মানুষের আসল নামটাই তো তার পরিচয় বহন করত।"

এতক্ষণ কথা বলে হাঁপিয়ে উঠলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব। দম নেওয়ার জন্য থামলেন।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ব্যাসদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মুখে কিছু বললেন না।

ছোট একটা শ্বাস টেনে ব্যাসদেব আবার বললেন, 'পদবি জুড়ে একজন মানুষের নামকে লম্বা করার কারণ কী?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'ওই পদবিতেই তার জাতিত্ব মানে তার উচ্চতা ও নীচতা প্রকাশ পায়।'

'দেখ ছোকরা, সেই প্রথম থেকেই হেঁয়ালি করে কথা বলে যাচ্ছ। বয়স হয়ে গেছে আমার। করে গুনে হিসেব রাখিনি। তবে হাজার পাঁচেক বছর তো হবে। সব হেঁয়ালির অর্থ বুঝতে পারি না এখন। একটু ঝেড়ে কাশ তো বাছা।' ধীরে ধীরে বললেন ব্যাসদেব।

আপনার সময়েও তো সমাজে চারটা বর্ণ ছিল– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আর শূদ্র?'

'ছিল তো। আমিই তো গীতায় শ্রীকৃষ্ণের দোহাই দিয়ে চতুর্বর্ণের কথা লিখেছি। এটাও উল্লেখ করেছি যে, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে এই বিভাজন।'

'এখনকার পৃথিবীতে গুণ আর কর্মকে ভিত্তি করে মানুষের বিভাজন হয় না।'

'তাহলে?'

'কোথায় জন্মালাম, সেটাই মুখ্য বিষয়। বিএ, এমএ পাস দিয়ে মন্ত্রী ব্যারিস্টার হলেও পরিচয়ের সময় ব্রাহ্মণ সন্তান, শূদ্র সন্তান এসব বলে পরিচয় দেওয়া হয়। জন্মস্থানটাই আসল, গুণের মূল্য শূন্য।'

'জন্মস্থান মানে! হস্তিনাপুর, পাঞ্চাল, অবন্তী, গান্ধার, কলিঙ্গ—এরকম স্থানের কথা বলছ তুমি? এসব স্থানে জন্মালে.....।'

'না, না, মহামহিম। এরকম স্থানগত জন্মের কথা বলছি না আমি। আমি বলতে চাইছি বংশের কথা।' ব্যাসদেবের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন অদ্বৈত।

'বুঝিয়ে বল।'

আপনার সময়ে তো চন্দ্রবংশ, সূর্যবংশ, যাদব বংশ–এসব ছিল। চতুর্বর্ণের ব্যাপারটাও ছিল। তবে আজকের ভারতবর্ষের মতো প্রকট ছিল না। এখন মানুষের পরিচয় হয় ব্রাহ্মণ, শূদ্র– এসব দিয়ে। ব্রাহ্মণরা মাথায় তুলে রাখার আর শূদ্ররা পায়ে পিষে মারার। শূদ্রদের মধ্যে আবার অনেক শ্রেণিবিভাজন করে রেখেছে ব্রাহ্মণরা। উত্তম শূদ্র এবং অধম শূদ্র। আমি অধম শূদ্রের একজন মানুষ।'

'মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে আমার। শূদ্রের মধ্যে আবার উত্তম অধম কী? শূদ্র শূদ্রই।' বিচলিত কণ্ঠে বললেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

'শূদ্রদের মধ্যে নমঃশূদ্র নামে আরেকটা শ্রেণি করা হয়েছে। মেথর, ব্যাধ, ধোপা, নাপিত, চণ্ডাল, জেলে– এরা নমঃশূদ্রের মানুষ। এদের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উল্লেখের আগে নমঃ মানে মাননীয় এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সত্য, প্রকৃত পক্ষে এরা নরাধম।' ম্রিয়মাণ গলায় বলে গেলেন অদ্বৈত।

ব্যাসদেবের চোখ এবার কপালে উঠল, 'বল কী ছোকরা? তাহলে তো আমিও নরাধম! জেলেনারীর গর্ভে যে আমার জন্ম!'

অদ্বৈত এবার মিষ্টি একটু হাসলেন। বললেন, 'নানা যুক্তি খাড়া করে আপনাকে তাবড় তাবড় পণ্ডিতরা ব্রাহ্মণ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছেন এখন পৃথিবীতে।'

'ব্রাহ্মণ! সে কী রকম?'

'মেছোনির পেটে আপনি জন্মালেও বাবা তো আপনার ব্রাহ্মণ, দোর্দণ্ডপ্রতাপী ঋষি পরাশর আপনার বাবা। মা যা-ই হোন, পিতৃকুলের বিচারে আপনি নাকি ব্রাহ্মণ।'

'তা কী করে হয়! ভারতবর্ষে পিতার চেয়ে মায়ের মর্যাদা বেশি। মাকেই স্বর্গপ্রাপ্তির আধার হিসেবে সম্বোধন করা হয়। মায়ের স্থান পিতার চেয়েও অনেক উঁচুতে।' বলতে বলতে উদাস হয়ে গেলেন ব্যাসদেব। তাঁর মা মৎস্যগন্ধার কথা মনে পড়ে গেল তাঁর।

উপরিচর বসু নামের এক রাজার কামের ফসল তাঁর মা। স্ত্রীকে প্রাসাদে রেখে মৃগয়ায় গিয়েছিলেন তিনি। অরণ্যমধ্যেই কামাসক্ত হন। তিনি সংযমী পুরুষ ছিলেন না। বীর্য স্খলিত হল তাঁর। তিনি যে বীর্যবান পুরুষ স্ত্রীর কাছে তার তো প্রমাণ দেওয়া দরকার। অতঃপর বাজপাখির পায়ে বীর্যধারক পত্র বেঁধে রাজধানীতে পাঠালেন। আকাশ পথে আরেক পাখির আক্রমণে সেই বীর্য পতিত হল যমুনাজলে। ওই বীর্য ভক্ষণ করল বিশাল এক মৎস্যা। মাছের পেটেই বড় হতে থাকল শিশু। কালক্রমে জেলের জালে মাছটি ধরা পড়ল। পেট থেকে বের হল এক কন্যা আর পুত্র। সংবাদ পেয়ে রাজা উপরিচর পুত্র সন্তানটিকে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। কন্যাটি থেকে গেলেন জেলেটির ঘরে। কন্যাটির সারা গায়ে মাছের গন্ধ, তাই তার নাম হল মৎস্যগন্ধা। ধীবররাজের ঘরে বড় হতে লাগল কন্যাটি। কালো কিন্তু অসাধারণ সুন্দরী মৎস্যগন্ধা। বিবাহযোগ্য হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। কিন্তু এই মেয়েকে বিয়ে করবে কে? ওর শরীর থেকে যে বিদ্‌ঘুটে গন্ধ বেরোয়। চিন্তিত হলেন দাশরাজা। বাড়ির পাশেই যমুনা নদী, সেখানে লোক পারাপারের ঘাট। কত মুনিঋষির যাতায়াত ওই খেয়াঘাট দিয়ে! খেয়া পারাপার করানোর জন্য সেই ঘাটেই পাঠালেন তিনি মৎস্যগন্ধাকে। তৃপ্ত হয়ে কোনো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ঋষি যদি আশীর্বাদ করেন, কন্যাটির শরীর থেকে মাছের গন্ধ দূর হতেই পারে।

অনেকদিন পর সেই আশীর্বাদের সন্ধ্যাটি এল। সন্ধ্যা হয় হয় এরকম সময়ে পরাশর মুনি এলেন খেয়া পার হতে। ওই সন্ধ্যায় তিনি একাই যাত্রী ছিলেন। কূল থেকে একটু দূরে গেলে মুনির নজর পড়ল মৎস্যগন্ধার ওপর। মৎস্যগন্ধা আপনমনে নৌকা বাইছে আর আনমনে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন পরাশর। শ্মশ্রুধারী শীর্ণদেহী মুনির মনে তীব্রভাবে রিরংসা জাগল। এবং যমুনার মধ্যিখানে অনেকটা জোর করে উপগত হলেন তিনি মৎস্যগন্ধার সঙ্গে। ওপারে উঠে যাবার সময় অবশ্য তিনি আশীর্বাদ করে গেলেন– আজ হতে তোমার শরীর থেকে মাছের গন্ধ উধাও হয়ে যাবে। পুষ্পগন্ধী হবে তুমি।

অনেকটা আপন মনে আবার বলতে শুরু করলেন ব্যাসদেব, 'ঋষি পরাশর ব্রাহ্মণ, মানি। কিন্তু মা তো আমার জেলেনি। মাছের পেটে জন্মেছেন, জেলের ঘরে লালিতপালিত হয়েছেন। সেই মায়ের গর্ভে জন্মানো আমি কী করে ব্রাহ্মণ হই? মায়ের পরিচয়েই তো আমার পরিচয়। জেলেনির সন্তান বলে পরিচয় দিতে পেরে আমার গর্বের কি শেষ আছে?'

অদ্বৈত মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'মুনিবর পরাশরের সঙ্গে আপনার আর সাক্ষাৎ হয়নি?'

'হয়েছে।' উদাস গলা ব্যাসদেবের।

'ক্ষণিক রমণেচ্ছায় উত্তেজিত হয়ে একজন পূতপবিত্র কুমারীকে যে তিনি রমণ করলেন, তার জন্য কি তাঁর মধ্যে কোনো বিবেক যন্ত্রণা জাগেনি? জিজ্ঞেস করেননি আপনি?' উত্তেজিত গলায় বললেন অদ্বৈত।

অদ্বৈতের কথা যেন শুনতে পাননি, এমনভাবে বলতে লাগলেন ব্যাসদেব, 'কী নিদারুণ লজ্জা আর কী দুঃসহ কষ্টের দিন যে গেছে মায়ের! দশমাস পিত্রালয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে জীবনযাপন করে গেছেন মা। শুধু দাশরাজা আর তাঁর স্ত্রী জানতেন কন্যার লাঞ্ছনার কথা। শাড়ির আঁচলে উঁচু পেট ঢেকে প্রতি মুহূর্তে যন্ত্রণা পেতে পেতে সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে গেছেন আমার দুঃখিনী মা-টি। একদিন আমাকে প্রসব করলেন তিনি। পরাশর এসে যজনযাজন অধ্যয়নের দোহাই দিয়ে আমাকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে গেলেন একদিন। তাঁর পূর্বকৃত রিরংসাপরায়ণতার কথা কতবার জিজ্ঞেস করার জন্য মনস্থ করেছি, কিন্তু তাঁর সামনে গিয়ে কুঁকড়ে গেছি আমি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তোমার জিজ্ঞাসাগুলো আমার মনে যে জাগেনি এমন নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে জিজ্ঞেস করবার শক্তি আমার মধ্যে জাগ্রত করতে পারিনি। তবে তাঁকে আমি সারাজীবন ক্ষমা করতে পারিনি। আমার গোটা জীবনের আরাধ্য থেকে গেছেন আমার মা।'

'আপনার জীবনে ঋষি পরাশরের কোনোই কি প্রভাব নেই?'

'আছে। অবশ্যই আছে। এই যে, আমার বেদ-বেদান্ত পাঠ, এই যে আমার যজনযাজন, সর্বোপরি গীতা-মহাভারত থেকে শুরু করে অষ্টাদশ পুরাণাদি লিখার এই যে জ্ঞানগম্যি, তার সবটাই তো ঋষি পরাশরের কাছ থেকে পাওয়া।'

"গীতার কথা তুললেনই যখন, একটা প্রশ্ন করি। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মনে যখন মৃত্যুভয় ঢুকে, পুণ্যসঞ্চয়ের আশায় যে বইটি প্রথমেই গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন শুরু করে, তার নাম 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'। তাদের বিশ্বাস, এই গ্রন্থই তাদের স্বর্গে নিয়ে যাবে। শুধু তা-ই নয়, শ্মশানগামী মৃতদেহের বুকের ওপর এই গ্রন্থটি রাখা হয়। ভেবে দেখুন, আপনি এবং আপনার গ্রন্থ ভারতীয় সনাতন সমাজে কত গভীরভাবে মাননীয়। অথচ.....।"

কথা সম্পূর্ণ না করে থেমে গেলেন অদ্বৈত।

'অথচ, অথচ কী অদ্বৈত?' দ্রুত জিজ্ঞেস করলেন ব্যাসদেব।

মহাপণ্ডিত ঋষিবর ব্যাসদেবের মুখে নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে বড় ভালো লাগল অদ্বৈতের। সেই ভালোলাগা কণ্ঠেই বললেন, 'না বলছিলাম কি, সেই মাননীয় ব্যাসদেবের উত্তরাধিকারীদের প্রতি বর্তমান ভারতবর্ষে কী ভীষণরকম ঘৃণা বর্ষিত হয়, তা নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস হবে না আপনার। আমরা নিকৃষ্ট জাতি, মাছমারার জন্যই আমাদের জন্ম, অধ্যয়ন করার অধিকার আমাদের নেই। যদিও দুচারজন শিক্ষিত জেলেকে কৃত্রিম হাসিমুখে গ্রহণ করে ওরা, কোনো কিছু লিখতে গেলেই যত ঝঞ্ঝাট। জেলে আবার কী লিখবে? ওরা লিখতে এলে, পড়তে এলে মাছ মারবে কে, এ রকমই ভাবনা ওদের।'

'এসব কী বলছ তুমি?' বিব্রত কণ্ঠে শুধালেন ব্যাসদেব।

'অপরাধ নেবেন না মাননীয়। কোনোরকমে ম্যাট্রিক পাস করেছিলাম আমি। কোন ভূতে পেল আমাকে, লিখতে বসলাম একদিন।'

'কী লিখলে তুমি?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

"কী আর লিখব ঋষিবর! আমার সমাজটাকেই তো চিনি ভালো করে। ভালো করে না চিনে তো আর লিখা যায় না। তাই আমার সমাজ নিয়ে একটা উপন্যাস লিখলাম, 'তিতাস একটি নদীর নাম' নামে।"

'উপন্যাস কী?'

"আপনিও উপন্যাস লিখেছেন, কবিতায়, 'মহাভারত' নামে। আমি লিখেছি গদ্যে। সাদা কথায় কাহিনী বলা যায় উপন্যাসকে।"

'সবাই লিখে, তুমিও লিখেছ। আপত্তিটা কোথায়?' বললেন ব্যাসদেব।

"আপত্তিটা কোথায় ভালো করে জানি না। তবে আমার আগে জেলেদের নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা উপন্যাস লিখেছিলেন, 'পদ্মানদীর মাঝি' নামে।"

'জেলেদের নিয়ে তুমিও লিখলে। তুমি যেহেতু জেলেসমাজের লেখক, তোমার তো লেখার দায়িত্ব ও অধিকার দুটোই আছে।'

"লিখেই আমার কাল হলো। রে রে করে উঠল সবাই। একজন ব্রাহ্মণ লিখেছে ঠিক আছে, কোথাকার কোন অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সে লিখতে যাবে কেন? এ নিয়ে নানা কথাবার্তা? একদিন ওই উচ্চবর্ণেরই এক লিখিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, এক 'পদ্মানদীর মাঝি' থাকতে 'তিতাস একটি নদীর নাম' লিখতে গেলে কেন? কাগজকলমের অপচয় নয় কি?"

'তো তুমি কী বললে?' বিস্মিত ব্যাসদেব।

'আমি আর কী বলব মহর্ষি! বললাম, মানিক তো বাওনের পোলা আর আমি জাউলার পোলা।'

স্মিত চোখে অদ্বৈতের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ব্যাসদেব। মনে মনে তাঁর তারিফ না করে পারলেন না। অদ্বৈত যখন আজ বিকেলে এলেন, বড়ই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তিনি। দুপুরের আহার শেষে দিবানিদ্রা যাওয়া তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যেস। ডাল, আলুভর্তা আর চচ্চড়িটাও বেশ ভালো হয়েছিল আজ। প্রয়োজনাতিরিক্ত খেয়েও ফেলেছিলেন। নিদ্রাটাও এসেছিল জম্পেশ। দৌবারিক সেই নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে জানিয়েছিল, কোন এক অদ্বৈত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। চোখেমুখে প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকেছিলেন তিনি। ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর ভেতরের বিরক্তি কখন কেটে গেছে বুঝতে পারেননি ব্যাসদেব। এখন অদ্বৈতের সঙ্গে কথা বলতে বেশ ভালোই লাগছে তাঁর।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিরজীবীদের একজন তিনি। হনুমানজীও চিরজীবী। ব্যাসদেবের দুটো আবাসস্থলের পরেই হনুমানজীর আবাসস্থল। আরও গোটা দশেক চিরজীবী এই এলাকায় বসবাস করেন। এটা স্বর্গের অত্যুত্তম এলাকা। স্বর্গের দক্ষিণাংশে এই এলাকাটি। উত্তরাংশে অন্যান্য পুণ্যবানদের বসবাস। তাঁদের আবার স্বর্গবাসের সময় নির্ধারণ করা আছে। চিত্রগুপ্তের পরামর্শক্রমে যমরাজাই নির্ধারণ করেন সময়। পৃথিবীতে পুণ্যার্জনের মাত্রার ওপর সময় নিরূপণ করা হয়। পুণ্য বেশি হলে বেশিদিন স্বর্গবাসের অনুমতি মেলে, পুণ্য কম হলে কম সময়ের জন্য। কারও জন্য সহস্র বছর, কারও জন্য সহস্র সহস্র বছর। আবার কারও জন্য দু'চার পঞ্চাশ একশ বছর। যুধিষ্ঠিরাদি অন্যান্য পুণ্যবানরা সহস্র সহস্র বছরের স্বর্গবাসের অধিকার পেয়েছেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ পেয়েছেন একশ বছরের স্বর্গবাসের অধিকার। সাধারণ স্বর্গবাসীরা চিরজীবীদের এলাকায় অনুমতি ছাড়া আসতে পারেন না। চিত্রগুপ্তের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। এই অনুমতি নিয়ে গান্ধারী, সত্যবতী, দ্রৌপদী, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, যুধিষ্ঠির–এঁরা মাঝেমধ্যে ব্যাসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। যেমন আজকে এসেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বললেন, 'যাক ওসব কথা। পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ সে যুগেও ছিল, তোমাদের যুগেও তেমনি আছে, অন্যের উন্নতি সহ্য করতে পারে না তারা। যেমন অর্জুন সহ্য করতে পারেনি একলব্যের সমরকুশলতার উন্নয়ন। তোমার ক্ষেত্রেও হয়তো সেরকম কিছু একটা হয়েছে। এই ধরনের ক্ষুদ্র লোক না থাকলে মহৎকে চেনা দায়। আচ্ছা তোমাকে একটা প্রশ্ন করি– কোন পুণ্যবলে তুমি স্বর্গে আসতে পারলে?'

'আমার যে কী পুণ্য, আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বেঁচেছিলাম আমি। আপনার যেমন যমুনা নদীতে জন্ম, তেমনি তিতাস নদীর পারে আমার জন্ম। আমার চেয়ে ভাগ্যবান আপনি। জীবনের প্রথমে মায়ের স্নেহ এবং শেষে পিতার আশ্রয় পেয়েছিলেন। খুব কম বয়সেই মা-বাবা দুজনেই আমাকে ছেড়ে পরলোকে চলে আসেন। তারপর না ঘরকা না ঘাটকার জীবন আমার। বোন ছিল একজন। বিয়ের পর সেও মারা গেল। গোকর্ণ ঘাটের এক স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করলাম আমি। কুমিল্লায় এসে কলেজে পড়তে চাইলাম। পারলাম না। টাকাপয়সা ছিল না তো আমার কাছে। তার পর কলকাতা। পত্রিকা অফিসে চাকরি করতাম, থাকতাম মেসে। বেতন যা পেতাম, সামান্য আমার জন্য রেখে বাকিগুলো গাঁয়ের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আত্মীয়স্বজনের সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দিতাম। তারপর একদিন যক্ষ্মা হল, মারা গেলাম। যমরাজার সামনে নিয়ে যাওয়া হল আমাকে। পাশে বসা চিত্রগুপ্ত যমরাজের কানে কানে কীসব বললেন। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে যমরাজ বললেন, 'বালক, পৃথিবীতে বেশকিছু ভালো কাজ করেছ তুমি। নিজের সম্প্রদায়ের সুখ-দুঃখ, বেদনাপ্রাপ্তির বিবরণ দিয়ে কী যেন একটা লিখেছ। তোমার দেশবাসীরা এজন্য ধন্যধন্য করছে তোমার নামে। আর তুমি নাকি পরোপকারী। যাও তোমাকে এক শতাব্দী স্বর্গবাসের অনুমতি দিলাম। সুখে স্বর্গবাস করতে থাক তুমি।' এই আমার ইতিহাস মহর্ষি।

ব্যাসদেব ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমার কথায় আমি খুব তৃপ্ত হয়েছি। আমার পরে আমার বংশধারাকে বহমান রেখেছ তুমি। লেখার ব্যাপারটিও তুমি চর্চা করেছ। নিশ্চয় ভালো কিছু লিখেছ, নাহলে গোমড়ামুখো যমরাজ তোমার প্রশংসা করবেন কেন?'

'আপনার বংশধারা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হতে বসেছে মহর্ষি।'

'কেন কেন? ওদের প্রজনন ক্ষমতা কি ফুরিয়ে গেছে?'

'না, তা নয়। এই সমাজে ব্যাপকভাবে প্রজনন ক্রিয়া চলে। সন্তানাধিক্য প্রতি ঘরে ঘরে। সমস্যা অন্যখানে।'

'অন্যখানে? সে কেমন?'

'পদবি দিয়েই তো এখন মানুষের বংশমর্যাদা, তাই জেলেরা তাদের মূল পদবি নামের শেষে আর লিখছে না। লিখছে উঁচু জাতের পদবি, এই যেমন সেনগুপ্ত, চৌধুরী, রায়, চক্রবর্তী এসব। এতে জেলেদের আসল পরিচয় উঁচু পদবিতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তাই বলছিলাম, আগামী দশ বিশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে কোনো জেলে থাকবে না। আপনার অথবা আমার অহংকার করবার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না ভূভারতে।' বলে হাহা করে হেসে উঠলেন অদ্বৈত। পরক্ষণেই নিজের অশোভন আচরণ টের পেলেন। ত্বরিত বললেন, 'ক্ষমা করবেন মহর্ষি। অশোভনভাবে হেসে উঠলাম।'

'বালক, তোমার এ হাসির মর্মার্থ আমি বুঝি। এ হাসিতে তোমার হৃদয়ের রক্তক্ষরণের ব্যাপারটি মিশে আছে, অনুধাবন করতে পারছি আমি। তুমি ভয় পেও না।'

'যদি নির্ভয় করেন, আরেকটি প্রশ্ন করি আপনাকে।'

অদ্বৈতের দিকে প্রীতির চোখে তাকালেন ব্যাসদেব। কালাকোলা শ্মশ্রুমণ্ডিত বিশাল আকৃতির এই মানুষটির ভেতর একটা দরদি মন আছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ওই হৃদয় দিয়েই মানুষকে বিচার করেন তিনি। অদ্বৈতকেও হৃদয় দিয়ে বুঝবার চাইলেন। অদ্বৈতের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'বল, কী জানতে চাইছ তুমি?'

"গোটা 'মহাভারত' জুড়ে আপনি জড়িয়ে ছড়িয়ে আছেন। এই মহাকাব্যের পরতে পরতে আপনার আদর্শ, আপনার ভাবনা, জীবন সম্পর্কে আপনার নিজস্ব বিচার বিশ্লেষণ দৃশ্যমান। সত্য ও সততার জয়গান করেছেন আপনি। দুষ্টের বিনাশের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন গোটা মহাকাব্য জুড়ে। ধর্মের জয় অনিবার্য– এই কথাই বলেছেন বারবার 'মহাভারতে'। শুধু 'মহাভারত' কেন 'গীতা'তেও আপনি ন্যায় ও সত্যের জয়গান করে এসেছেন। নিজে ন্যায়বান না হলে কখনো ন্যায়ের পক্ষে কথা বলতে পারে না কেউ। কিন্তু ভাসুর হয়ে অনুজের বউদের সঙ্গম করেছেন আপনি। একজন ন্যায়ের ধ্বজাধারী হয়ে একাজ করতে গেলেন কেন?"

অদ্বৈতের প্রশ্ন শুনে দ্রুত মাথা নোয়ালেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে অধোবদনে থাকলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুললেন। বললেন, 'দেখ অদ্বৈত, আজ পর্যন্ত কেউ সাহস করেনি আমাকে এই প্রশ্নটি করার। তুমি দুঃসাহসী। আর দুঃসাহসী হবেই না কেন? তোমার তো একটা আদি ঐতিহ্য আছে। সনাতনীদের ধর্মে দশজন অবতারদের কথা আছে না?' প্রশ্ন করে অদ্বৈতের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলেন না তিনি। বললেন, 'দশ অবতারের প্রথম অবতারের নাম মৎস্য অবতার। সেই মৎস্যের সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক। আমাদের বংশধারার সঙ্গে প্রথমাবতারের অবিচ্ছিন্ন নৈকট্য। তো সেই ঐতিহ্যবাহী হয়ে এরকম প্রশ্ন করার সাহস তো তোমারই হবে। তুমি বড় কঠিন প্রশ্ন করেছ আমাকে। আমার একদিকে নৈতিকতা, অন্যদিকে মাতৃ-আদেশ। মা সত্যবতী বললেন, অনুজ-বধূদের সঙ্গে রমণে রত হও, নীতিবোধ বলল– খবরদার ব্যাস, এত বড় অন্যায় কোরো না। আচ্ছা অদ্বৈত, এই রকম অবস্থায় পড়লে তুমি কী করতে?'

প্রশ্নটা বুমেরাং হয়ে তাঁর দিকে ফিরে আসবে, ভাবেননি অদ্বৈত। ব্যাসদেবের প্রশ্ন শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন অদ্বৈত। আমতা আমতা করে বললেন, 'আমি! আমি কী করতাম ঠিক করতে পারছি না।'

ব্যাসের গম্ভীর কণ্ঠ এই সময় অদ্বৈতের কানে ভেসে এল, 'আমি ঠিক করতে পেরেছিলাম। মা মৎস্যগন্ধা, যিনি পরে রাজা শান্তনুর মহিষী হয়ে সত্যবতী হয়েছিলেন, আমার পৃথিবী ছিলেন, এই মায়ের সন্তুষ্টির জন্য লক্ষ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বছরের নরকবাস আমার কাছে ঈপ্সিত ছিল। যতই অন্যায় হোক, মায়ের আদেশ ফেলি কী করে? মাও নিরুপায় ছিলেন, বংশধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে যে। যাকে তাকে দিয়ে তো আর পুত্রবধূদের প্রজনন করানো যায় না। তাঁর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলাম আমি। তাই প্রজনন নিষ্পন্ন করার জন্য আমাকেই নির্বাচন করলেন মা। বিবেককে গলাটিপে হত্যা করে তিন তিনবার অন্যায় কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলাম আমি।' ব্যাসদেবের কণ্ঠ দিয়ে মর্মযাতনা ঝরে ঝরে পড়তে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে অদ্বৈত প্রশ্ন করলেন, 'ফল কি শুভ হয়েছিল?'

'নিশ্চয়ই না। এই অন্যায় কার্যের ফল শুভ হয়নি। অম্বিকা, অম্বালিকা আর দাসীটির গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু আর বিদুর জন্মাল। দাসীপুত্র বলে রাজপ্রাসাদে বিদুর অবহেলিত হল, মুনির অভিশাপে পাণ্ডু প্রজনন ক্ষমতা হারাল। ধৃতরাষ্ট্রের একশটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মাল। ধৃতরাষ্ট্র তো অন্যায়ের ফসল। তার সন্তানরা আর কতটুকু ভালো হবে। দুঃশাসন, দুর্যোধনরা সমস্ত হস্তিনাজুড়ে যুদ্ধের দামামা বাজাল। কুরুক্ষেত্রের আঠারো দিনের যুদ্ধে আঠারো অক্ষৌহিণী সৈন্য প্রাণ হারাল। ধৃতরাষ্ট্রের বংশে বাতি দেওয়ার কেউ থাকল না। একটা সময়ে যুদ্ধ শেষ হল বটে, গোটা হস্তিনায় পোড়া-রক্তভেজা মাটি আর লক্ষ নারীর হাহাকার ছাড়া আর কিছুই থাকল না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ব্যাসদেবের বুক চিরে বেরিয়ে এল। তারপর বললেন, 'আমার দ্বারা যে পাপটা করিয়েছিলেন মা, রক্তসমুদ্রের প্লাবনে সেই পাপ ধুয়ে মুছে গিয়েছিল পৃথিবী থেকে।'

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বেদনাবিলীন চেহারা দেখে আর কিছু বলতে সাহস করলেন না অদ্বৈত মল্লবর্মণ। বাইরে তাকিয়ে দেখলেন– চারদিকে আঁধার ঘনীভূত হয়ে গেছে। মাটিতে মাথা নুইয়ে প্রণিপাত করলেন ব্যাসদেবকে। করজোড়ে বললেন, 'যাবার অনুমতি দিন মহর্ষি।'

ব্যাসদেব মুখে কিছু বললেন না। শুধু ডান হাতটা অভয়ের ভঙ্গিতে উঁচু করে তুলে ধরলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কুন্তীর বস্ত্রহরণ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এক.

সে রাতে 'মহাভারত' পাঠের আসর বসেছে মালোপাড়ায়।

চাঁপাতলা গাঁয়ের একঠেরে মালোপাড়াটি। শ' খানেক মালো পরিবারের বসবাস এ পাড়ায়। ক'শ বছর ধরে এই চাঁপাতলা গাঁয়ে মালোরা বসবাস করছে, তার সঠিক সুলুকসন্ধান দিতে পারে না কেউ। এক একজনের এক এক দাবি। সুনীল সরকার বলে, 'শ'তিনেক বছর তো হবেই।' অজয় মণ্ডল বলে, 'কি যে কও না ভাইপো! কত যুগ যুগ ধইরে এই চাঁপাতলায় আমাদের পূর্বপুরুষরা বাস কইরে আসছে, তার কোনো হিসেবনিকেশ আছে? কম কইরে হলেও তো পাঁচশ বছরের মালোকাহিনী এই পাড়ার আকাশে বাতাসে। ওই যে বড় তেঁতুল গাছটা দেখছ, বাবা বইলছিল ছোডবেলায়, ওই গাছটা লাগাইছিল আমার বাপের দাদার দাদার দাদায়। তয় আমার বয়স চাইর কুড়ি পুরাইল সেইদিন। ভাইবে দেখ, এই পাড়ার বয়স কত হইল।'

অজয় মণ্ডল আবেগি মানুষ। বিয়ে থা করেনি। প্রথম যৌবনে মাছ ধরত ভৈরব নদে। বয়স যৌবনের ওপারে গেলে গানে-কীর্তনে ঝুঁকে পড়ল। কীর্তনীয়াদল নিয়ে এগাঁয়ে ওগাঁয়ে নামকীর্তন করে বেড়াত। তারপর তো বয়সটা চেপে ধরল অজয়কে। কীর্তন গাওয়া ছেড়ে দিল। মশগুল হল 'মহাভারত' নিয়ে। সন্ধ্যায় নিজ দাওয়ায় 'মহাভারত' খুলে বসত। গুন গুন করে কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' পড়ত। সেই পাঠে একজন দুজন করে এসে বসতে লাগল। একদিন ওই পাঠে এসে উপস্থিত হল শান্তনু। শান্তনু সরকারের বয়স চল্লিশের আশেপাশে। বড় সুরেলা কণ্ঠ শান্তনুর। যেন কণ্ঠে সরস্বতী বসা। এক সন্ধ্যায়, অনেক মানুষের সামনে 'মহাভারত'টা শান্তনুর দিকে ঠেলে দিয়ে অজয় মণ্ডল বলেছিল, "আজ থেইকে ভাইপো তুই-ই পাঠ করবি 'মহাভারত।' বড় অহংকার ছিল মনে। ভাবতাম, আমার মতো গাইয়ে নেই এই ভূমণ্ডলে। ভগবান তোরে পাঠায়ে আমার দর্প চূর্ণ করল। তোর মতো সুরদাসকে পাঠায়ে দিল আমাদের কাছে। আজ থেইকে এই আসরে তুই 'মহাভারত' পাঠ কইরবি আর আমি বুঝাইয়া দিব মানুষেরে।"

সেই সন্ধ্যা থেকে 'মহাভারত' পাঠ করে শান্তনু, ব্যাখ্যা করে অজয় মণ্ডল, মানে এ পাড়ার অজয় জেঠা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আগে আগে অজয় মণ্ডলের দাওয়ায় পাঠের আসর বসত। এখন তা ছড়িয়ে গেছে গোটা পাড়ায়। এক এক সন্ধ্যায় এক একজনের বাড়িতে 'মহাভারত' পাঠ হয়। শ্রোতাও কম হয় না, এ আসরে। চাঁপাতলার মালোপাড়ায় এখন 'মহাভারত' পাঠ হয় ঘটা করে।

আজ 'মহাভারত' পাঠ হচ্ছে কুন্তীর উঠানে।

কুন্তীর বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। কুন্তীর স্বামীর নাম ভীষ্ম। মালোদের নাম পুরাণঘেঁষা। 'রামায়ণ-মহাভারত' তাদের নামের উৎস। গৌর, নিতাই, দ্বারকা, মথুরা, রাধা, যশোদা, বলরাম, কৃষ্ণ, উর্বশী, সুমিত্রা– এরকমই নাম রাখে তারা। তাই কুন্তীর স্বামীর নাম ভীষ্ম হওয়া খুব অবাক হবার ব্যাপার নয়। 'মহাভারতে'র ভীষ্ম চিরকুমার। মালোভীষ্ম চিরকুমার নয়। বিয়ের বয়স হলে মালোভীষ্মের সঙ্গে কুন্তীর বিয়ে হয়। ভীষ্মের ঘরে চার পুত্র। কুন্তী তার পুত্রদের নাম রেখেছে– যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল, সহদেব। হাসতে হাসতে কুন্তী বলে, 'আরেকটা ছাওয়াল হইলে নাম রাখতাম ভীম।'

মথুরাবালা মুচকি হেসে বলে, 'তোমারে মানা করে কে?'

কুন্তী হাসিকে চোখ পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে নিজের পেটের দিকে ইশারা করে বলে, 'জমি ঠা ঠা হয়ে গেছে। আর হওনর সুযোগ নাই।'

কুন্তীর বাপ ছিল পালাকার। দেশে দেশে রাবণ বধ, কর্ণকুন্তী সংবাদ, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, ভীষ্মের শরশয্যা– এসব পালা গেয়ে বেড়াত কুন্তীর বাপ। বাপের রক্ত কুন্তীর শরীরে। 'মহাভারতে'র কাহিনী তাকে হাসায়, কাঁদায়। কাহিনী শুনতে শুনতে তার মধ্যে কত শত প্রশ্ন জাগে! প্রশ্ন জাগলেই অজয় জেঠাকে জিজ্ঞেস করে। অজয় জেঠার উত্তরে কুন্তী সবসময় সন্তুষ্ট হয় না। অনেক অমীমাংসিত প্রশ্ন তার মনের মধ্যে গুমরে মরে।

কুন্তী অজয় জেঠার মহাভারত-আসরের নিয়মিত শ্রোতা। খুব বড় অসুখবিসুখ না করলে বা পারিবারিক কঠিন সমস্যায় না পড়লে কুন্তী উপস্থিত থাকে প্রতিটি আসরে।

আজ শান্তনু পড়ছে 'সভাপর্ব্ব'। গত কয়েকদিন ধরে বড় বেদনা শ্রোতাদের মনে। ক'দিন ধরে 'সভাপর্ব্ব' পাঠ চলছে আসরে। এই পর্বে 'মহাভারতে'র যত বেদনা, যত বিষাদ। এই পর্বেই 'মহাভারতে'র যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। শ্রোতারা গেল ক'দিন ধরে কুরুদের চালাকি, শকুনির ধূর্তামি যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের অসহায়তা আর নিষ্ক্রিয়তার কথা শুনছে। যতই ধর্মের দোহাই দেওয়া হোক, বলা হোক নিয়মনীতির কথা, যুধিষ্ঠির যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

একজন জুয়াড়ি এবং অদক্ষ জুয়াড়ি সেটা অন্যরা না মানুক, কুন্তী মানে। যে অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির অন্য চার ভাইসহ দ্রৌপদীকে বাজি ধরেন, সেই অধ্যায়েই, পাঠের মাঝখানে, কুন্তী বলে ওঠে, 'যুধিষ্ঠির তো জুয়াড়ি। লজ্জাশরম নাই তার। থাকলে কি আর বউয়েরে বাজি ধরে!'

সেরাতে শান্তনু পাঠ করছিল। জেঠা বুঝাচ্ছিল– যুধিষ্ঠির একে একে সব ভাইকে পাশায় হারালেন। তারপর নিজেকে বাজি ধরলেন। যুধিষ্ঠিরের মতিভ্রম হয়েছে। নইলে শকুনির চাল বুঝতে পারবেন না কেন? নিজেকে হারানোর পর শকুনি দ্রৌপদীকে বাজি ধরার জন্য যুধিষ্ঠিরকে প্ররোচিত করল। প্রথমে দোনামনা করল যুধিষ্ঠির। কিন্তু জুয়ার নেশা বলে কথা। শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীকে বাজি ধরলেন যুধিষ্ঠির। শান্তনু সুর করে পড়ছে—

এতেক শুনিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির।
পাশা ফেল আরবার সেই পণ স্থির ॥
এতেক শুনিয়া দুষ্ট পাশা ফেলাইল।
হাসিয়া শকুনি বলে জিনিল জিনিল ॥
শুনি কর্ণ দুর্যোধন হাসে খল খল।
মহা আনন্দিত কুরুসোদর সকল ॥

কুন্তীর মন্তব্যের কোনো উত্তর দিতে পারেনি অজয় জেঠা, সেবেলায়। বড় কঠিন প্রশ্ন কুন্তীর, বড় যৌক্তিক জিজ্ঞাসা। আবেগমথিত হয়ে কুন্তীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। বলা যায়– যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কখনো ভুল করেন না। তিনি যা করেছেন, ধর্মানুকূলে থেকেই করেছেন। সেখানে কোনো প্রশ্ন করা যায় না।

কিন্তু কুন্তী তো বাস্তবতার নিরিখে উত্তরটা পেতে চেয়েছে। বাস্তবতা আর অন্ধ আবেগের মধ্যে বিস্তর ফারাক। কুন্তীর মন্তব্যকে মেনে নিলে ধর্মকে অপমান করা হয়, আর পুরাণকে মেনে নিলে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয়। বড় দোটানায় পড়ে গেল অজয় মণ্ডল।

নিচের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কুন্তী, তোমার প্রশ্ন বড়ই বাস্তব, বড়ই কঠিন। আজ তোমার এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিব না। আর একদিন, অন্য কোনো আসরে তোমার মন্তব্যের উত্তর দিব আমি।'

ওখানেই সমাপ্ত হয়েছিল সেদিনের পাঠ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুই.

আবুল কাশেম চেঙ্গুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে আবুল কাশেম। সর্বদা টুপি রাখে মাথায়। গালিগালাজের সময় টুপি মাথা থেকে নামিয়ে নেয়। বলে, 'টুপি মাথায় রেখে শাসন করা যায় না। শাসন করার সময় তো আর মুখ দিয়ে মিডা মিডা কথা বের হয় না।'

একাত্তরের রাজাকার এই আবুল কাশেম। এখন ধোয়া তুলসীপাতা। যুদ্ধের শেষদিকে গ্রাম থেকে পালিয়েছিল। পঁচাত্তরে হাওয়া বদলে গেল। রাজাকাররা দেশকর্তা হল। আর দেশপ্রেমিকরা কোলাবরেটরের কলঙ্ক নিয়ে এলাকা ছাড়ল। ক্রমে ক্রমে আবুল কাশেম মাথা তুলল। পালিয়ে যাওয়া অথবা এতদিন চুপ মেরে থাকা আলবদর আলশামসরা আবুল কাশেমের চারদিকে একটা বলয় তৈরি করল। আবুল কাশেম প্রথমে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার হল। পরের বার চন্দ্রকান্ত চৌধুরীকে জানের ভয় দেখিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হল। সেই থেকে অনেক বারের চেয়ারম্যান আবুল কাশেম। কেউ সাহস করে না, তার বিরুদ্ধে ইলেকশনে দাঁড়াতে। চেঙ্গুটিয়া ইউনিয়ন তার কথায় ওঠে, তার ইচ্ছেতেই বসে।

আবুল কাশেম চেয়ারম্যানের চোখ পড়েছে মালোদের শ্মশানের ওপর। ভৈরব নদের পারে শ্মশানটি। বহু বহু বছর পূর্ব থেকে এখানে মালোরা দাহকার্য সম্পন্ন করে আসছে। বড় সুন্দর জায়গা। নানা ধরনের গাছ গোটা শ্মশান জুড়ে। সেগুন গাছই বেশি। গাছের দাম বর্তমান বাজারমূল্যে কোটি টাকার কাছাকাছি। চেয়ারম্যান চায় ও জায়গায় একটা বাগানবাড়ি বানাতে। বিপুল গাছগাছড়ার মাঝখানে সুন্দর একটা চৌচালা বাগানবাড়ি। সামনে বিরাট উঠান। উঠানে নরম ঘাস। একটা পুকুরও কাটাবে আবুল কাশেম। পড়ন্ত বিকেলে পুকুরপাড়ে বসে তসবি পড়তে পড়তে মাছেদের খেলা দেখার বড্ড সাধ আবুল কাশেমের।

একদিন মালোপাড়ায় উপস্থিত হল আবুল কাশেম। মালোদের ডেকে বলল, 'দেখ মালোর পো-রা। ওই জায়গাটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। ওখানে আমি একটা এবাদতখানা করব। মানুষ পোড়াবার জন্য তো অত বড় জায়গার দরকার নাই। আমি তোমাদের জন্য একটা শ্মশানখানা গড়ে দিচ্ছি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেয়ালও কইরে দিমু চাইরদিকে। কাছে তো নদী থাকবেই। কী বল মালোর পুতরা। রাজি তো তোমার?'

অজয় মণ্ডল, শান্তনু, সুধাংশু, সুনীল, দুলাল বিশ্বাসরা চুপ করে থাকে। ওরাই মালোপাড়ার মাথা। মাথাদের মাথা হেঁট দেখে আবুল কাশেমের জোশ বেড়ে যায়। বলে, 'চুপ থাইকো না তোমরা। ভাবাভাবির দরকার নাই। যা বলছি রাজি হইয়া যাও। লাভ ছাড়া লোকসান অইব না তোমাদের।'

হঠাৎ করে ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে আসে কুন্তী। সামান্য ঘোমটা টেনে বলে, 'এ কী কইতাছেন চেয়ারম্যান সাব! পুস্তপুরুষের শ্মশান আমাদের! আমাদের বাপ-দাদা, তাদের মা-বাপ, কত শত আত্মীয়স্বজনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওই শ্মশানের সঙ্গে! আপনি কী কইরে বলেন ওই শ্মশান ছেড়ে দিতে?'

আবুল কাশেম ভ্যাবাচ্যাকা খায়। কেউ, বিশেষ করে কোনো নারী তার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করবে, আশা করেনি আবুল কাশেম। চোখের কোনা জ্বলে ওঠে তার। তবে তা সামান্য সময়ের জন্য। নিজেকে সামলে নিয়ে পাশে দাঁড়ানো ফখরে আলমের দিকে তাকায়। ফখরে আলম তার পদলেহী। ভীষণ বুদ্ধি রাখে সে। বড় বড় সংকটে এই ফখরে আলমের বুদ্ধিতে পার পেয়ে গেছে আবুল কাশেম। ফখরে আলম যেন 'মহাভারতে'র শকুনি। শকুনি যেমন সর্বদা দুর্যোধনের পাশে পাশে থেকে কুবুদ্ধি জোগাত, ফখরে আলমও আবুল কাশেমের সঙ্গে থেকে বুদ্ধি আর কুবুদ্ধি জোগায়।

ফখরে আলম বলে ওঠে, 'ভীষ্মের বউ কুন্তী হুজুর।' তারপর চাপাস্বরে বলে, 'মালোপাড়ার জয়নাব হুজুর। বাচ্চাকাচ্চা হলে কী হবে, দেখতে কচি ডাব হুজুর।' তারপর গলা উঁচু করে বলে, 'এই পাড়ার মালোরা কুন্তীকে বড় মানে হুজুর।'

যা বোঝার আবুল কাশেম বুঝে গেল। কণ্ঠকে একেবারে খাদে নামিয়ে বলল, 'দেখ বেটি, যদিও পুরুষ থাইকতে মেয়ে মাইনষের সঙ্গে কথা বলা আমি পছন্দ করি না, তারপরও শুনলাম– তোমাকে এ পাড়ার মালোরা ভক্তি শ্রদ্ধা করে, তাদের শ্রদ্ধায় আস্থা রেখেই বলছি– তোমাদের শ্মশানটা অতি জংলা, সাপখোপের আস্তানা। এখানে ওখানে জলজলা। একপাশে নদীভাঙন। বলি কী, ওটার পরিবর্তে বাঁধানো শ্মশান বানিয়ে দেব তোমাদের।'

'দরকার নাই আমাদের বাঁধানো শ্মশানের। পূর্বপুরুষের শ্মশান আমাদের মাথায় থাক। ওই শ্মশানের দিকে নজর দিবেন না চেয়ারম্যান সাব।' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল কুন্তী।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিস্ময়ে চোখ বেরিয়ে আসতে চাইছে আবুল কাশেমের। কী বলবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না সে। পাশ থেকে ফখরে আলম চাপাস্বরে বলল, 'সাবধান হুজুর, মাথা গরম কইরবেন না। যা বইলবেন ঠাণ্ডা মাথায় বলেন।'

এই সময়ে মালোদের মধ্য থেকে আওয়াজ উঠল, 'কুন্তী ঠিক বলেছে চেয়ারম্যান সাহেব। ওইটা আমাদের পবিত্র জায়গা। ওটার দিকে চোখ দিবেন না।'

মিষ্টি হেসে আবুল কাশেম বলল, 'তোমাদের পাল্‌স বুঝি আমি। দেখ, মানুষ ভালো চায়। একটা খারাপকে ছেড়ে একটা খুব ভালোকে পেতে তোমাদের আপত্তি কেন বুঝলাম না! আর তুমিও মাইয়া, এতগুলো পুরুষ থাকতে তুমিও কেন যে মাঝখানে কথা বলতে গেলা বুঝলাম না!' কুন্তীর দিকে চোখ রেখে কথা শেষ করল চেয়ারম্যান।

'ওকে ধমকাবেন না চেয়ারম্যান সাব। কুন্তী মাসি আমাদের মনের কথাই বলেছে।' সুনীল সরকার ভিড় থেকে বলে উঠল।

'শোনো মালোর পুত। যতই হইচই কর, তোমাদের হাঁড়ির খবর রাখি আমি। এই যে মালোপাড়ায় তোমরা বসবাস করছ, বাস্তুভিটের কোনো দলিল-দস্তাবেজ আছে তোমাদের কাছে? নাই। শ্মশানের দলিলের কথা নাই বা বললাম।'

তারপর মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিল আবুল কাশেম। সমবেত জেলেদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই ভূমি আমার। আমার বাবায় একসময় জমিদার নগেনবাবুর কাছ থেকে কিনে নিয়েছিল ওই শ্মশানটা। দলিল আছে আমার কাছে। তোমাদের চার মাস সময় দিয়ে গেলাম। ওই জায়গা ছাড়বে তোমরা। আর হ্যাঁ, আজ থেকে কোনো মরা পোড়াবে না তোমরা ওখানে।' কথা শেষ করে পেছন ফিরল আবুল কাশেম। পেছনে ফখরে আলম। ফখরে আলমের পেছন পেছন সাঙ্গোপাঙ্গরা।

দল থেকে দু'কদম এগিয়ে তৌহিদ জিজ্ঞেস করে, 'ফখরে ভাই, এই যে চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, ওঁর বাবা জমিদারবাবুর কাছ থেকে শ্মশানটা কিনে নিয়েছেন, কথাটা সত্য নাকি? বাপের কাছে শুনেছি– চেয়ারম্যানের বাবা নাকি কামলাগিরি করত বেলেডাঙ্গার শ্যামসুন্দরবাবুর জমিতে।'

'খবরদার হারামির বাচ্চা। আর একটা কথা বলছস তো জিভ বাইর কইরা নিমু। না-ও কিনে যদি, কিনতে কতক্ষণ রে হারামজাদা। দেশ আমাদের। সামনের ইলেকশনে আমাদের দলই ক্ষমতায় আইবো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দলিল বানাইতে কতক্ষণ লাগে রে হালারপোত।' ফখরে আলম গর্জে ওঠে।

ফখরে আলমের গলা শুনে আবুল কাশেম পেছন ফেরে। জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। ফখরে আলম বলে ওঠে, 'ও কিছু না হুজুর। তৌহিদ্যার এলেম কম। তাকে এলেম দিচ্ছিলাম। গলাটা উঁচু হয়ে গেল একটু। মাফ করেন হুজুর।'

আবুল কাশেম মুচকি হাসে। হাঁটতে হাঁটতে দুজনের কথা শুনেছে সে। ফখরে আলমের কথা শুনে দিল খুশ হয়ে গেল তার। তার উপস্থিত বুদ্ধি অতি চমৎকার। এইজন্য ফখরে আলমকে পছন্দ করে সে।

তিন.

তাঁরা তিন ভাই– ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর। তিনজনই অবৈধ সন্তান। কিন্তু রাজমাতা সত্যবতী তিনজনকেই মেনে নিয়েছেন। পিতা একজন, মহাভারত রচয়িতা ব্যাস। ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু রাজবধূর গর্ভে জন্মালেও বিদুরের মা দাসী। রাজসভায় তাই বিদুর অবহেলিত। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ, পাণ্ডু প্রজনন ক্ষমতারহিত।

ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র। পাণ্ডুর পাঁচ। এই পাঁচজনের জন্ম আবার পাণ্ডুর ঔরসে নয়। পাণ্ডুর পুত্রদের পাণ্ডব বলা হয়। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা কৌরব নামে অভিহিত। জ্যেষ্ঠ বলে এবং রাজ্যবিষয়ে পাণ্ডু উদাসীন বলে ধৃতরাষ্ট্রের হাতে রাজ্যভার। রাজ্য ধৃতরাষ্ট্রের শাসনে থাকলে কী হবে, রাজ্যাধিকার পাণ্ডবদেরও আছে। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রান্ধ। জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধনের ধমকানিতে সবার বড় হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দিতে অস্বীকৃতি জানালেন ধৃতরাষ্ট্র। ইন্ধন জোগাল শকুনি।

পাণ্ডুর মৃত্যু হয়েছে অনেক আগে। পাণ্ডবরা যৌবনপ্রাপ্ত হলে রাজ্যাধিকার চাইলেন। পাঁচখানি গ্রাম দিতেও রাজি হলেন না ধৃতরাষ্ট্র। উপরন্তু ধনে-প্রাণে নিঃস্ব করতে চাইলেন পাণ্ডবদের। এ কাজে প্রধান ভূমিকা রাখল দুর্যোধন। শকুনির প্ররোচনায় পাশাখেলার আয়োজন করা হল। রাজসভায় আনা হল পঞ্চপাণ্ডবকে। কুযুক্তি ও কূট ভাষার মারপ্যাঁচে যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় মগ্ন করানো হল।

খেলায় দক্ষ ছিলেন না যুধিষ্ঠির। শকুনি পাশাবিদ। তার চালে যুধিষ্ঠির একে একে ধন, রাজ্য, হর্ম্য– সবই হারালেন। বাকি থাকলেন স্বয়ং তিনি, অন্য চার ভাই এবং স্ত্রী দ্রৌপদী। শকুনি জিজ্ঞেস করল, 'অতঃপর কিসের পণ করবে ভাগনে?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যুধিষ্ঠির বললেন, 'ভাইদের অঙ্গে যত অলঙ্কার আছে, তা সবের পণ করলাম।'

পাশার চালে শকুনি তাও জিতে নিল। ক্রূর হাসি ছড়িয়ে পড়ল দুর্যোধন ও অন্যান্য কুরুভ্রাতার মুখে।

শকুনি বলল, 'অতঃপর?'

'আমার কাছে পণ করার মতো আর কিছুই নেই।' করুণ কণ্ঠে যুধিষ্ঠির বললেন।

'আছে, আছে তো ভাগনে! তোমার ভাইয়েরা আছে না!' শকুনি ত্বরিত বলল।

তারপর যুধিষ্ঠির একে একে ভাইদের পণ ধরলেন। হারলেন। তারপর নিজকে পণ ধরলেন। পাশাখেলায় নিজেকে হারিয়ে চার ভাইসহ কুরুবংশের দাসে পরিণত হলেন।

কর্ণ উচ্চস্বরে হেসে বললেন, 'এবার কাকে পণ করবে যুধিষ্ঠির?'

দুর্যোধন বলল, 'কী যে বল না মিত্র! দ্রৌপদীর মতো সুন্দরী স্ত্রী থাকতে জ্যেষ্ঠের আবার চিন্তা কিসের! এবার নিশ্চয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্রৌপদীকে বাজি ধরবেন।'

এই সময় শকুনি বলে উঠল, "ভাগনে দুর্যোধন তোমার মতিভ্রম হয়েছে। 'রূপেতে লক্ষ্মীর সম যাহার বর্ণনা, অসংখ্য যাহার গুণ না হয় গণনা', সে রকমের দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠির কখনো পণ করবে না। আর যদি দ্রৌপদীকে বাজি ধরেও বা আমাদের পরাজয় নিশ্চিত। কারণ দ্রৌপদী কখনো হারানোর নয়।'

যুধিষ্ঠির বুদ্ধি হারালেন। দ্রৌপদীকে বাজি ধরলেন। শকুনির কূটচালে দ্রৌপদীকেও হারালেন যুধিষ্ঠির।

দুর্যোধন প্রতিকামী পাঠাল দ্রৌপদীকে আনবার জন্য।

দ্রৌপদী তখন ইন্দ্রপ্রস্থে। ইন্দ্রপ্রস্থ পাণ্ডবদের রাজধানী। প্রতিকামী ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে দ্রৌপদীকে সভাস্থলে নিয়ে এল।

দুর্যোধন দ্রৌপদীর রূপে বিভোর। কামাগ্নিতে তার ভেতরটা পুড়ছে তখন। তাই দুঃশাসনকে বলল, 'নিষ্ক্রিয় হয়ে আছ কেন দুঃশাসন? বিবস্ত্র কর দ্রৌপদীকে। নয়নের সুখ মিটাই।' তারপর জানুর বস্ত্র উন্মোচন করে সেখানে ডানহাতে মৃদু আঘাত করে দুর্যোধন আবার বলল, 'তারপর দ্রৌপদীকে এখানে বসিয়ে দেহের তাপ কমাব।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চার.

আসরের সবাই অশ্রুসজল। বাক্‌রুদ্ধ অজয় মণ্ডল। কুন্তীর ক্রোধান্বিত চোখ। শান্তনু পড়ছে–

একবস্ত্র পরিহিতা দ্রৌপদী সুন্দরী।
দুঃশাসন টানিতেছে বসনেতে ধরি ॥
ছাড় ছাড় বলি কৃষ্ণা ঘন ডাক ছাড়ে।
সভামধ্যে ধরি তার অঙ্গ-বস্ত্র কাড়ে ॥
সংকটে পড়িয়া দেবী না দেখি উপায়।
আকুল হইয়া কৃষ্ণা স্মরে যদুরায় ॥
ঝরঝর ঝরে অশ্রুজল দুনয়নে।
কাতরেতে কৃষ্ণা ডাকে দেব নারায়ণে ॥

কুন্তী চিৎকার দিয়ে উঠল, 'থাম, থাম শান্তনু। আর পইড়ো না। আর শুনতে ভালো লাগে না।' তারপর অজয় মণ্ডলের দিকে ফিরে বলে, 'নারীর অপমানের কথা আর ব্যাখ্যা কইরো না জেঠা।' বলতে বলতে কেঁদে দিল কুন্তী।

অজয় মণ্ডল শান্তস্বরে বলল, 'শান্ত হও কুন্তী, শান্ত হও। কাঁইদো না।'

'কীভাবে বল তুমি জেঠা আমাকে শান্ত হতে! স্বামীদের সামনে স্ত্রী এরকম অপমানিত হচ্ছে, আর অথর্ব স্বামীরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সে দৃশ্য! ধিক তোমাদের জেঠা, ধিক পুরুষদের।'

'তোমার কথা মানি কুন্তী। কিন্তু ধর্মের কথাও তো তুমি মাইনবে।' মৃদুস্বরে বলে অজয় জেঠা।

'ধর্মের কথা! কিসের ধর্মের কথা? স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার আছে। অধিকার আছে বলে স্বামী স্ত্রীকে যা ইচ্ছে তা-ই কইরতে পারে– এই তো বইলতে চাইছ তুমি! আমি মানি না সেই ধর্মকথাকে।' কুন্তী আকুল হয়ে বলে।

এই সময় শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে– সত্যিই তো! স্ত্রী বলে কি তার কোনো অস্তিত্ব নেই, তার নিজস্ব কোনো মানমর্যাদা নেই! স্বামীর অন্যায় ইচ্ছেয় সায় দিতে হবে নাকি দ্রৌপদীকে?

অনীল সরকার বলে উঠল, 'কুন্তী ঠিকই বলেছে জেঠা। যুধিষ্ঠির বড় অন্যায় করেছে দ্রৌপদীর ওপর।'

'বস্ত্র হরণে যদি দ্রৌপদী লজ্জা পায়, নারীকুল যদি অপমানিত হয়, তবে তার সকল দায় ওই যুধিষ্ঠিরের, ওই পুরুষজাতির ওপরই বর্তায় সমস্ত দায়। এই আমার কথা।' শ্লেষ মেশানো গলায় বলে উঠল কুন্তী।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অপ্রস্তুত হয়ে অজয় মণ্ডল সবার দিকে তাকিয়ে থাকল। তার কিছু বলতে ইচ্ছে করল না। কী বলবে অজয় মণ্ডল? এতজন সভাসদ, যেখানে ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাচার্য-বিদুর-ধৃতরাষ্ট্রের মতন মানুষরা উপস্থিত আছেন, উপস্থিত আছেন দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী, তাঁদের সামনে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করা হচ্ছে, একজন পুরুষও জ্বলে উঠলেন না! জনসমক্ষে একজন রাজবধূর এতবড় অপমানে কেউ প্রতিবাদ করলেন না! কেউ তাকিয়ে থাকলেন, কেউ বা থাকলেন অধোবদনে! ওই কুরুসভায় প্রকৃতপক্ষে নারীজাতির অপমান হয়নি, হয়েছে তো পুরুষজাতির। দ্রৌপদীর নগ্ন বক্ষ, উদোম শরীর দেখার ইচ্ছে কি তাহলে সকল সভাজনের মনে জেগেছিল? নইলে সকলে নির্বাক থাকলেন কেন? কুন্তী সত্যি বলেছে– দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সকল দায় পুরুষজাতির। সেরাতে আর 'মহাভারত' পাঠ জমল না। শান্তনুও পড়তে উৎসাহ হারাল। অজয় মণ্ডলের ব্যাখ্যা কেন জানি নিষ্প্রভ হয়ে গেল সেরাতে।

আস্তে আস্তে সবাই উঠে গেল আসর হতে।

পাঁচ.

অজয় মণ্ডলের বড় উঠান। ওই উঠানে মিটিং-এর আয়োজন করা হয়েছে। প্রধান বক্তা আবুল কাশেম। তার চারদিকে সাঙ্গোপাঙ্গরা। সামনে বিছানো চাটাইয়ে মালোরা। মালোরা যে ইচ্ছে করে এই মিটিং-এ এসেছে, এমন নয়। যারা আসতে চায়নি, তাদের ওপর জোর খাটানো হয়েছে। এক পাশে নারীরা আরেক পাশে পুরুষরা বসেছে। আবুল কাশেম বলছে, 'দেখ মালোর পুতরা, সামনে ইলেকশন। ইলেকশন মানে নির্বাচন। জাতীয় নির্বাচন। তোমাদের দলও দাঁড়িয়েছে। আমাদের পার্টির লোকও দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে বহুত ভোট দিয়েছ ওই ভারতমার্কা দলকে। এবার ভোট দিবা আমাদের পার্টির কেন্ডিডেটকে। বুঝছ?'

সমবেত মালোরা চুপচাপ থাকে। চোরা চোখে একজন অন্যজনের দিকে তাকায়। ফখরে আলম বলে ওঠে, 'কিরে বেটারা, কিছু বলছ না কেন? হুজুরে কী বলেছেন শুইনতে পাও নাই? কী অজয় মণ্ডল, কিছু বল।'

'কী আর বইলব হুজুর!' কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে অজয় জেঠা বলে।

'কী বইলবে মাইনে! কাকে ভোট দিবা সে কথা বইলবে।' ফখরে আলমের পাশে দাঁড়ানো শহীদুল বলে ওঠে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'আহ শহীদুইল্যা, মাথা গরম করস কেন? ওদের ভাইবতে দে। তা অনেকক্ষণ তো ভাইবলে, এবার বল আমার প্রস্তাবে রাজি আছ কিনা তোমরা?' আবুল কাশেম মাথা ঠাণ্ডা রেখে কথাগুলো বলে গেল।

কুন্তী দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে ডান হাত ছড়িয়ে বলল, 'আপনার প্রস্তাবে আমরা রাজি না। কাকে ভোট দেব তা আমরা ঠিক কইরব। কাকে ভোট দেব, তা নির্ধারণ কইরে দেওয়ার আপনি কে?'

'কে জানস না মাগি? চেয়ারম্যান সাহেব! তোর বাবা। তেরিমেরি করস কেন? তেল অইছে গায়ে। তেল চেঁছে নেব শরীর থেকে।' মাথাগরম শহীদুল গর্জে উঠল।

ফখরে আলম শহীদুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চড় দিতে দিতে বলল, 'হারামজাদা, মুখে টাট্টিখানা বসানো তোর? খারাপ কথা বলস হারামির পুত?'

আবুল কাশেম নরম সুরে বলে, 'বড় অন্যায় করে ফেলেছে শহীদুল। ওকে মাফ কইরে দাও তোমরা। আর হ্যাঁ, যা বলেছি, তার ব্যতিক্রম যাতে না হয়। মনে রেখ আমার কথা। মিটিং এখানে শেষ। আগামী পরশু ভোট। ব্যতিক্রম করবে না মালোর পুতরা।' কুন্তীর দিকে কড়া চোখ রেখে কথা শেষ করে আবুল কাশেম।

পথে যেতে যেতে আবুল কাশেম ফখরে আলমকে চাপাস্বরে বলল, 'আমাদের কেন্ডিডেট যদি হারে তাহলে ওই মাগির জন্য হারবে। মালোদের ভোট ছাড়া জেতার উপায় নাই। বড় বাড় বেড়ে গেছে রে কুন্তীর। দেমাক ভাঙার ব্যবস্থা কর।'

ছয়.

সেরাতে অজয় মণ্ডলের দাস্ত শুরু হল। দাস্তের সঙ্গে ভেদবমি। শেষ রাতে মারা গেল অজয় জেঠা। পাড়া ভেঙে মানুষ জড়ো হল অজয় জেঠার উঠানে।

অজয় জেঠাকে শ্মশানে নিয়ে আসা হয়েছে। ভৈরব নদের জলে স্নান করানো হয়েছে তাকে। সবাই শোকার্ত। চাঁপাতলার মালোপাড়ার একজনও আজ ঘরে নেই। আতুর রাধারানী, সেও এসেছে ছেঁচড়িয়ে ছেঁচড়িয়ে।

চিতায় তোলা হয়েছে অজয় জেঠার মরদেহ। চিতার চারদিকে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়েছে মালোরা। ব্রাহ্মণ তার প্রস্তুতিকার্য নিষ্পন্ন করছে। অশ্রুসিক্ত চোখে কুন্তী

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্রাহ্মণকে সাহায্য করছে। প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে মুখাগ্নি করা হবে অজয় জেঠার। শান্তনুই জেঠার মুখাগ্নি করবে। শান্তনুর চেয়ে আপনজন আর কে ছিল জেঠার!

এই সময় হই হই করে শ্মশানে ঢুকে পড়ল আবুল কাশেম চেয়ারম্যান। সঙ্গে দলবল। আবুল কাশেম চিৎকার করে বলল, 'তোদের তো সাহস কম না মালাউনের বাচ্চারা! নিষেধ করা সত্ত্বেও মরা নিয়ে এসেছিস এখানে? তোদের বলি নাই এই জায়গা আমার? বন্ধ কর এসব।'

'বন্ধ কইরব না। এইটা আমাদের জায়গা, আমাদের শ্মশান। এইখানে অজয় জেঠাকে পোড়ানো হবে। দেখি কী কইরতে পারেন।' চিৎকার করে বলল কুন্তী।

আবুল কাশেম মাথার টুপি খুলে বলল, 'বেশি বাড় বাইড় না বেটি। ভালো হবে না কিন্তু।'

'কী ভালো হবে না, হ্যাঁ? কী ভালো হবে না?' চেয়ারম্যানের দিকে দু'কদম এগিয়ে কুন্তী তর্জনী নেড়ে বলল।

আবুল কাশেম হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠল, 'ফখরে আলম রে-!'

আবুল কাশেমের দল মালোদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এত কিরিচ এত লাঠিসোঁটা কোথায় ছিল কে জানে। সবার হাতে হাতে লাঠিসোঁটা আর কিরিচ।

কিছু মালো পালিয়ে বাঁচল, কিছু মাটিতে লুটিয়ে কঁকাতে লাগল।

দাঁড়িয়ে থাকল কুন্তী।

আবুল কাশেম বলল, 'ফখরে, দেখ কিছু কইরতে পারিস কিনা।'

ফখরে নিকটে গেলে কুন্তী দূরে সরে যেতে চাইল। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারল না। শহীদুল এসে জুটল ফখরে আলমের সঙ্গে। শহীদুল একটানে কুন্তীর শাড়ি খুলে ফেলল। কুন্তীর পরনে শুধু পেটিকোট আর ব্লাউজ। নিতম্বে হাত দিল শহীদুল। এইসময় কোত্থেকে লাঠি হাতে দৌড়ে এল শান্তনু। ফখরে আলম লাঠির এক বাড়িতে শুইয়ে দিল শান্তনুকে। শহীদুল ততক্ষণে কুন্তীর পেটিকোটের ফিতে ধরে টান দিয়েছে। গিঁট খুলে গেছে। পেটিকোট খুলে নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে।

কুন্তী চোখ বন্ধ করল। তার গলা চিরে বেরিয়ে এল, 'ভগবান রে...।'

শ্মশানের পাশ দিয়ে বহমান ভৈরব নদে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুন্তী।

কুন্তীর পেটিকোট সামনে নিয়ে হা হা করে হেসে উঠল আবুল কাশেম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির বৃত্তান্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'খেয়াল করেছ?'

'কী?

'ছেলেটা কেমন করে দিন দিন বদলে যাচ্ছে।'

চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন চিত্তরঞ্জনবাবু। স্ত্রীর কথায় চোখ তুলে তাকালেন। কিছুটা আন্দাজ করেছেন তিনি। তারপরও বললেন, 'কার কথা বলছ?'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ছেলে আমাদের ডজন খানেক।' একটু করে হাসলেন সুপ্রভা দেবী। বললেন, 'ছেলে তো আমাদের ওই একটাই, অর্ণব। তার কথাই তো বলছি তোমা....।'

মুখের কথা কেড়ে নিলেন চিত্তরঞ্জনবাবু। বললেন, 'ছেলে তো আমাদের একটি নয়, তিনটি।'

করুণ চোখে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন সুপ্রভা দেবী। অতি চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুক চিরে বেরিয়ে এল। চিত্তরঞ্জনবাবু তা খেয়াল করলেন না। ডাইনিং টেবিলের ওপাশের দেয়ালে একটা ছবিবাঁধানো ফ্রেমের মধ্যে গভীর দৃষ্টিতে কী যেন খুঁজছেন তিনি। কাঁচা হাতের আঁকা ছবি। লাল-নীল-সবুজ রঙের পেন্সিলে আঁকা। একটি গাছ, গাছে থোকা থোকা লাল ফুল, ফুলের ফাঁকে দোয়েল বা কাকের ছবি। পাশে একটি জলধারা। এর পাশেই সবুজ মাঠ। ধানখেতই বোধ হয় আঁকতে চেয়েছে আঁকিয়েটি। ফ্রেমটি অতি যত্নে বাঁধাই করা।

কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জনবাবু। স্ত্রীর গলাখাঁকারিতে বাস্তবে ফিরে এলেন। হালকা চালে কথা বলতে চাইলেন তিনি। কিন্তু গলাটা ধরা ধরা শোনাল। বললেন, 'প্রথমটা যখন তোমার পেটে, সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে পুকুরঘাটে থালাবাসন ধুতে গেলে তুমি। পা পিছলে আছাড় খেলে। মৃত বাচ্চাই হল তোমার। ধাই বলেছিল– ছেলেই ছিল।' একটু থামলেন চিত্তরঞ্জনবাবু। তারপর বললেন, 'সেই সময় থেকে কীরকম পাগল পাগল ভাব তোমার। সংসারের কাজকর্ম সবই করে যাচ্ছিলে তুমি। একা যখন থাকতে, কোথায় যেন হারিয়ে যেতে। উদাসীন, অন্যমনস্ক। কিছু জিজ্ঞেস করলে ম্লান একটু হাসতে। মা একদিন ডেকে বলেছিল—'চিত্ত,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভালো ঠেকছে না। তুমি বউকে একটু সঙ্গ দাও। চাকরি নিয়েই তো তোমার দিন কাটে।'

'থাক না ওসব পুরনো দিনের কথা।' সুপ্রভা বললেন।

'ভুলেই থেকেছিলাম। তুমি কথাটা পাড়লে বলেই মনে পড়ে গেল। ভুল বললাম তোমাকে, ইচ্ছে করে মনের ভেতরে ওদের দুজনের স্মৃতি বড় একটা পাথর দিয়ে চেপে রেখেছিলাম।'

'দুজনের স্মৃতি!'

চিত্তরঞ্জনবাবু যেন স্ত্রীর কথা শুনতে পাননি। আপন মনে বললেন, 'অনেকটা বছর পরে পলাশ এল। যখন পলাশ জন্মাল, ফাগুন মাস তখন। পুকুরপাড়ের পলাশ গাছটি ফুলে ফুলে ছাওয়া তখন। বললাম– পলাশই রাখি তোমার ছেলের নাম। মৃদু হেসে সম্মতি দিয়েছিলে তুমি। এক দুই করে পাঁচ বছরে পড়ল ছেলেটা। আঁকিবুকির দিকে ঝোঁক তার। শুধু এখানে ওখানে আঁকতে চাইত। তোমার চাপাচাপিতে কাগজ আর রঙপেন্সিল এনে দিলাম। ওই নিয়েই পড়ে থাকত পলাশ। কত কিছুই যে আঁকত– ব্যাঙ, পুকুর, মাছ, নৌকা, মাঠ, সাগর। পলাশ গাছটার প্রতি গভীর একটা টান ছিল তার। একদিন বলেছিলাম– ওই গাছটার জন্যই তোর পলাশ নাম রেখেছি রে বাপ।' তারপর ডাইনিং টেবিলের দিকে ঝুঁকে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন চিত্তরঞ্জনবাবু। তর্জনী দিয়ে ফ্রেমে বাঁধাই ছবিটা দেখিয়ে বললেন, 'পলাশের মৃত্যুর পর অনেক ছবি থেকে ওই ছবিটা খুঁজে বের করেছিলাম আমি। বাঁধাই করে টাঙিয়ে ।'

হঠাৎ হু হু করে কেঁদে উঠলেন চিত্তরঞ্জনবাবু। তাঁর বুক চিরে দমকে দমকে কান্না বেরিয়ে আসতে লাগল। কান্না জড়ানো গলাতেই বলতে থাকলেন, 'যে দুপুরে মারা গেল পলাশ, আমি চাকরিতে ছিলাম। ফিরলাম যখন, উঠানে বসে পলাশের মৃতদেহ বুকে জড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদছ তুমি। আমাকে দেখে তোমার আর্তনাদ আরও বেড়ে গেল। বলতে থাকলে– পলাশের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। রান্নাবাটির কাজ শেষে শরীরটা ভেঙে যাচ্ছিল, পলাশকে পাশে শুইয়ে বললাম, ঠিকদুপুর এখন বাবা, শরীরটা আমার ভালো যাচ্ছে না। মায়ের পাশে শুয়ে থাক। কালঘুমে পেয়েছিল আমায়। কোন ফাঁকে উঠে গেল। মধুরামের ছেলের সঙ্গে পুকুরে নামল। সাঁতার তো জানত না পলাশ। তারপর 'পলাশরে' বলে আর্তচিৎকার দিয়ে উঠেছিলে তুমি। মূর্ছা গিয়েছিলে। সেই মূর্ছা ভেঙেছিল দুদিন পর, হাসপাতালে।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিত্তরঞ্জনবাবু তাকিয়ে দেখলেন– স্ত্রীর গণ্ড বেয়ে দুটো অশ্রুধারা নেমে যাচ্ছে।

'এরপর অনেকটা বছর কেটে গেল।' অশ্রুপাত করতে করতে সুপ্রভা বললেন।

'টুপ করে মা-টা মারা গেল। গাঁয়ের প্রতি টানটা কমল আমার। পুকুরটা দেখলে প্রাণটা কৈছালি করে উঠত। যেখানে যেখানে পলাশ ঘুরে বেড়াত, সেসব জায়গা আমাকে উন্মাদ করে তুলত। তুমি কথা বলা কমিয়ে দিলে। ইতিউতি কী যেন শুধু খুঁজে বেড়াতে। তোমার দিকে তাকালে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠত আমার। একদিন ঠিক করলাম– গাঁ ছাড়ব। তোমাকে না জানিয়ে শহরে বাসাও ঠিক করে ফেললাম। সওদাগরি অফিসে চাকরি আমার। মালিক আমার কাজে খুশি হয়ে প্রমোশনও দিল একটা। তুমি গাঁ ছাড়তে রাজি হওনি। আমার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত নিমরাজি হয়েছিলে তুমি। গাঁ ছাড়ার আগের রাতটা পুকুরপাড়ে কাটিয়েছিলে। ভোরসকালে তোমাকে টেনে এনেছিলাম ঘরে।' ধীরে ধীরে বলে গেলেন চিত্তরঞ্জনবাবু।

'এরপর অর্ণব এল।' মৃদু কণ্ঠে সুপ্রভা বললেন।

'ওর আসার কথা কিছুই জানাওনি আমায়। জানতে পারলাম তিন মাস পেরিয়ে গেলে। একরাতে বললে– তোমার পেটে বাচ্চা এসেছে। খুশি হবারই কথা আমার। কিন্তু বুকটা কেন জানি কেঁপে উঠেছিল, আশঙ্কায়। যদি আবার মৃত সন্তান হয়, যদি কোনো দুর্ঘটনায় মারা যায়। সেরাতে খুশি হবার বদলে দম বন্ধ হয়ে আসছিল আমার। দুজন ছেলের অকালমৃত্যুতে বুকটা এমনিতেই দুমড়ানো মুচড়ানো ছিল। বিশ্বাস কর, ওই রাতে ঈশ্বরের কাছে এক অদ্ভুত প্রার্থনা করে বসেছিলাম আমি– হে ঈশ্বর, সন্তানই যদি দেবে, পুত্র সন্তান দিও না, কন্যাই দিও। কেন এরকম অদ্ভুত প্রার্থনা করেছিলাম? ভেবেছিলাম, বারবার পুত্র হয়েছে আমাদের, কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে বা অভিশাপে অকালে মৃত্যু হয়েছে তাদের। পুত্রশোক যে কী কঠিন ব্যাপার, সে আমি জানি। ভুল বললাম। শুধু আমি জানি কেন, তুমি তো আমার চেয়ে আরও বেশি করে জান। তুমি যে মা। সেই রাতে এক অলৌকিক বিশ্বাস আমার ওপর ভর করেছিল। মেয়ে হলে আমাদের সন্তান বেঁচে থাকবে– এ রকম একটা বিশ্বাস আমার মস্তিষ্কের খোপে খোপে অনুরণিত হচ্ছিল।' থামলেন চিত্তরঞ্জনবাবু।

এবার প্রশান্ত হেসে সুপ্রভা বলে উঠলেন,'ভগবান তোমার কথা শোনেননি কিন্তু। অর্ণবই তো হল।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'তুমি উৎফুল্ল হয়ে উঠলে নবজাতককে নিয়ে। তুমি যতই উৎফুল্ল হয়ে উঠতে, আমি ততই মনমরা হতাম। তবে আমার ম্রিয়মাণতা তোমাকে বুঝতে দিইনি কখনো। একদিন অবশ্য তুমি মুখ খুলেছিলে। বলেছিলে– তোমার মনমরা থাকার অর্থ আমি বুঝি। তোমার মধ্যে গভীর একটা আশঙ্কা কাজ করে। কিন্তু আমার মনে হয় কি জান, অর্ণব আমাদের ছেড়ে যাবে না। স্থানান্তরে এসেছি যে! গ্রাম থেকে শহরে এসেছি। ফাঁড়া কেটে গেছে আমাদের, দেখে নিও। তোমার বিশ্বাসটাই সত্য হল।'

'অর্ণব বড় হতে লাগল। এক দুই করে করে ছয়ে পড়ল। আমি চারে স্কুলে দিতে চাইলাম, তুমি রাজি হলে না। বললে– ওর শৈশবটা কেড়ে নিও না। খেলতে দাও ওকে।' সুপ্রভা বললেন।

'খেলার ফাঁকে ফাঁকে পড়াতে লাগলাম ওকে। ওর লেখার হাতটা দারুণ ছিল। দাদা যে আঁকাজোকা করত। ও অবশ্য সেদিকে যায়নি। তবে তার লেখার মধ্যে দাদার কীর্তি ফুটে উঠতে লাগল।'

একটু থেমে দম নিলেন চিত্তরঞ্জনবাবু। বললেন, 'সুন্দর হাতের-লেখার জন্য স্কুলে অনেকবার পুরস্কার পেয়েছে সে। থ্রি-ফোরের খাতাগুলো এখনো যত্নে রেখে দিয়েছি আমি। একদিন ওর ছেলেকে দেখিয়ে চমকে দেব।'

'এর মধ্যে তেইশটি বছর পার হয়ে গেল। কী দ্রুতই না সময়টা ফুরিয়ে গেল!' আফসোসের গলায় বললেন সুপ্রভা দেবী।

'এক অর্থে তোমার কথা ঠিক। অন্যদিক দিয়ে ভাবলে ঠিক নয়। তেইশটি বছর তো আর এমনি এমনি যায়নি। আমাদের চোখের সামনেই তো অর্ণব ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। প্রথম বাসাটির কথা নিশ্চয় মনে আছে। ওই যে অভয়মিত্র রোডের বাসাটি। চৌচালা টিনশেডের বাসা। মার্গারেট দিদির বাড়ি ছিল ওটি। ছেলেটি বিয়ে করে বরিশাল চলে গিয়েছিল। স্বামীটি মারা গেলে আয়-ইনকাম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দিদির। আমার সঙ্গে কথা বলে ভালো লেগেছিল তার। বাড়ির একটা মাঝারি রুমে সরে গিয়ে বাড়িটা ভাড়া দিয়েছিল আমাদের।' বলে গেলেন চিত্তরঞ্জনবাবু।

সুপ্রভাও পেছন দিনের স্মৃতিতে জড়িয়ে পড়লেন। বললেন, 'বড় ভালো মহিলা ছিল দিদি। এ রকম মায়াবতী মানুষ আমি জীবনে দু'চারজন দেখেছি। আমরা যে ভাড়াটে, কোনোদিন বুঝতে দেয়নি। কেমন কেমন করে অর্ণবের শিক্ষার দায়িত্বটাও নিয়ে নিল দিদি।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিত্তরঞ্জন ডান হাতের তালু দিয়ে কপালটা একবার মুছে নিলেন। এই সকালে তাঁর কপাল ঘামার কথা নয়। কিন্তু তাঁর মনে হল– কপালে ঘাম জমেছে। পাকা চুলগুলোকে কপাল থেকে পেছনে সরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'এই জন্যই অর্ণবের ইংরেজিটা এত ভালো। এ্যাংলো দিদির হাতে পড়ে ছেলেটার ইংরেজি বেশ সড়গড় হয়েছিল। কিন্তু বেশি ভালো ভাগ্য সয় না আমাদের। বছর পাঁচেক পরে কোত্থেকে ছেলেটা এল। সঙ্গে বউ আর বাচ্চা। নাতিটিকে দেখে সব দুঃখ ভুলে গেল মার্গারেটদি। অর্ণবও একজন খেলার সঙ্গী পেয়ে খুব খুশি। যদিও দুজনের মধ্যে বয়সের পার্থক্য অনেক।'

'দিন দশেক পরে দিদিই খবরটা দিল আমাদের। বাড়িটা বিক্রি করে দেবেন। ছেলে বলছে– তার সঙ্গে বরিশাল চলে যেতে। ছেলে-নাতি-বউ নিয়ে ওখানে ভালোই কাটবে তার। খবরটা বজ্রাঘাতের মতো মনে হল। প্রথমে নিজেদের স্বার্থের কথাই ভেবেছি। এই উঠোন, ওই আমগাছটি, উঠোন কোণের শিউলি গাছটি, পুরনোদিনের বাংলোটাইপের বাড়িটা কখন যে আমাকে এরকম করে দখল করে নিয়েছে, টের পাইনি। যা হোক, আকারে ইঙ্গিতে জিজ্ঞেসও করেছিলাম– আমাদের ছেড়ে, স্বামী-সন্তানের স্মৃতি জড়ানো এই বাড়িটি ছেড়ে বরিশালে শান্তি পাবে কিনা মার্গারেটদি। তখন নাতিটি দিদিকে পেয়ে বসেছে। দিদি বলেছিল– নাতিটিকে নিয়ে দিন কেটে যাবে আমার। তাছাড়া ছেলে তার ভুল বুঝতে পেরেছে। ছেলে আর বউ মিলে সুখেই রাখবে আমাকে। সেই সুখ শেষ পর্যন্ত দিদির কপালে জোটেনি।' আস্তে আস্তে বললেন সুপ্রভা।

চিত্তরঞ্জন বললেন, 'বাড়িটি বিক্রি করার আগে দিদি আমাকে কেনার জন্য অফার দিয়েছিল। তখন আমার টাকা কোথায়? চোখের সামনে বাড়িটি বিক্রি হয়ে গেল। টাকাটুকা গুছিয়ে মার্গারেট দিদিকে নিয়ে এক সকালে চলে গেল ছেলেটি। নতুন বাড়িওয়ালা পরের ছয়মাস থাকতে দিয়েছিল আমাদের।'

সুপ্রভা বললেন, 'ওই বাড়ির ঠিকানাতেই তো দিদি চিঠিটি লিখেছিল মাস চারেক পরে। কী নিদারুণ কষ্টের কথাই না লিখেছিল! বাড়িবিক্রির টাকা দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন শুরু করেছিল ছেলে আর ছেলের বউ। মদ-ভাঙ আর ক্লাব নিয়ে পড়ে থাকত। ছোট্ট একটি ঘরে থাকতে দিয়েছিল দিদিকে। নাতিটাকেও মিশতে দিত না। চিঠিটা যেন চোখের জলে লেখা। চিঠিটা বহুবার পড়েছি। পড়তে পড়তে কতবার যে কেঁদেছি।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'এরপর তো কত বাড়ি বদলালাম। কোনো বাড়ির কথা তেমন করে মনে পড়ে না। অভাগী মার্গারেট দিদির জন্যই বোধ হয় বাড়িটার স্মৃতি মুছে যায়নি মন থেকে। চলে যাওয়ার দিন অর্ণব কেঁদেছিল খুব। এর পরে অর্ণব যখন কলেজ ডিঙিয়ে মেডিক্যাল কলেজে পড়তে গেল, একদিন বলেছিল, ইংরেজিটা ভালো করে না জানলে ডাক্তারি পড়া কঠিন। ছোটবেলায় মার্গারেট আন্টির কাছে ইংরেজিটা শিখেছিলাম বলে এখন আমায় বেগ পেতে হচ্ছে না।' চিত্তরঞ্জনবাবুর চোখেমুখে আনন্দটা ফুটে উঠল।

নাস্তা-চায়ের প্লেট-কাপ গুছাতে গুছাতে সুপ্রভা বললেন, 'সকালে তো তুমিই পৌঁছে দিতে স্কুলে। সেন্ট প্লাসিডস্ স্কুলটা আটটায় শুরু হতো। অর্ণবকে হাতমুখ ধুইয়ে, বাথরুম করিয়ে, স্কুলড্রেস পরিয়ে ঠিকঠাকমতো গুছিয়ে উঠতে পারতাম না আমি। স্কুলে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যেত। একদিন ওকে পৌঁছানোর দায়িত্ব নিলে তুমি । নয়টায় অফিস তোমার, ছেলের জন্য দেড় ঘণ্টা আগে বের হওয়া শুরু করলে তুমি। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কোনো কালেই এর ব্যতিক্রম হয়নি।'

চিত্তরঞ্জনবাবু বললেন, 'কাপ-প্লেট গুছিয়ে কোথায় যাচ্ছ? বস বস। তো একদিন হল কী, ক্লাস ফাইভে পড়ে বোধ হয় তখন, আমার আগে আগে হাঁটছে সে। ছোট্ট রাস্তা। ছেলেদের আর মেয়েদের স্কুল দুটো পাশাপাশি। দুটোই আটটায় শুরু। পড়ুয়া আর সাধারণ মানুষে ভিড় লেগেছিল রাস্তায়। কোত্থেকে এক বাবুর্চি এসে অর্ণবকে দিল ধাক্কা, ও পড়ে গেল রাস্তায়। ছোটবেলা থেকে সে তো একটু শক্ত ধাঁচের। কাঁদল না, কিন্তু ব্যথাতুর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। আমি দিশে হারালাম। কাঁধে খন্তা চামচওয়ালা লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি। রাস্তার ওপর ঠেসেই ধরেছিলাম তাকে। পথের মানুষ ছাড়িয়ে না নিলে বড় ধরনের কোনো একটা কিছু হয়ে যেত। এখন ভাবি– কেন করেছিলাম ওইদিন এই রকম বেমক্কা কাজটি। কোথায় বাবুর্চি আর কোথায় একজন অফিসার! ভুলে গিয়েছিলাম সব।'

'তুমি যে অর্ণবকে খুব বেশি ভালোবাস। তোমার অফিসের সুকান্তদা একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, যখন তোমার কাছে অর্ণব জন্মানোর খবরটা পৌঁছেছিল, সমস্ত প্রটোকল ভুলে ধেই ধেই করে নেচে উঠেছিল তুমি।'

চিত্তরঞ্জনবাবু একটু লজ্জা পেলেন যেন। মাথা নিচু করলেন। বললেন, 'আমি তখন অফিসের বেশ বড় অফিসার। সব ভুলে গিয়েছিলাম। বড়সাহেব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খবর পেয়ে ডাকা পাঠিয়েছিলেন। ভয়ে ভয়ে তাঁর ঘরে ঢুকেছিলাম। ড্রয়ার খুলে একটা খাম বাড়িয়ে ধরেছিলেন আমার দিকে, বলেছিলেন– আপনার ছেলের জন্য। গোটা অফিসকে মিষ্টি খাইয়েছিলেন সেদিন বড়সাহেব।'

সুপ্রভা বললেন, 'ও যখন মেডিকেলে সেকেন্ড ইয়ারে, তুমি রিটায়ারমেন্টে এলে।'

'তার আগে তেতলা বাড়িটা করলাম।'

স্বস্তির গলায় সুপ্রভা বললেন, 'ভাগ্যিস বাড়িটা করেছিল। মাথা গোঁজার ঠাঁই তো ছিল না আমাদের। বাড়ি ভাড়া দিয়েই তো সংসারটা চলছে এখন। আমার ছেলে কিন্তু তোমার খরচ করায়নি তেমন।'

'ঠিক বলেছ তুমি। ছেলে তোমার মেধাবান। ডাক্তারি পড়া শেষ করতে তেমন খরচখরচা হয়নি আমার।'

'শুধু গাড়িভাড়াটা দিতে হয়েছিল।' সুপ্রভা বললেন।

'যাতায়াতের ব্যাপারে ওর আবার রাজকীয় চাল। হোস্টেলে থাকতে দিইনি তাকে। হোস্টেলের যা পরিবেশ। হইহল্লা, গাঁজা, ইয়াবা। ওই একটি জায়গায় তোমার ছেলে আমার কথা শুনেছে। হোস্টেলে উঠার জন্য পীড়াপীড়ি করেনি।' বললেন চিত্তরঞ্জনবাবু।

সুপ্রভাত মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, 'আমাদের এই বাড়িটা থেকে মেডিকেল কলেজ কতই বা দূরে। রিকশায় যাবে না ছেলে, ট্যাক্সিতে যাবে। তাই প্রতিদিন তিনশ টাকা গুনতে হতো আমাকে।'

'এখন তো ইন্টার্নশিপ করছে। এখনো কি যাতায়াত ভাড়া নেয় তোমার কাছ থেকে?'

'নেয় না আবার!'

চিত্তরঞ্জনবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'থাক, থাক। যতদিন নিতে চায় নিক। ওই একটি মাত্র ছেলেই তো আমাদের।'

সুপ্রভা এবার ম্রিয়মাণ কণ্ঠে বললেন, 'সব তো ঠিক আছে। ডাক্তারি পড়া শেষ করে আনল, এখনো যাওয়ার আগে রুমালটা, ঘড়িটা, মোবাইলটা সামনে এগিয়ে ধরতে হয়। না হলে কোনো না কোনো একটা ফেলে রেখে চলে যায়।'

'এসব করতে ভালো লাগে না তোমার?' মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করেন চিত্তরঞ্জনবাবু।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুপ্রভা বললেন, 'ভালো লাগে না আবার! ও-ই তো ছেলে আমাদের। তোমাকে যা বলতে চেয়েছিলাম– কী রকম যেন একটা পরিবর্তন দেখছি তার মধ্যে ইদানীং। কেমন যেন রূঢ়রুক্ষ মেজাজ, কী রকম যেন কঠিন চোখে তাকিয়ে কথা বলে আমার সঙ্গে।'

'তাই নাকি?' চিত্তরঞ্জনবাবু জানতে চান।

বেদনাহত কণ্ঠে সুপ্রভা বললেন, 'গত পরশুর সকালের ঘটনাটি শোন না। সকাল আটটায় বেরিয়ে যাওয়ার কথা। সার্জারি ডিপার্টমেন্টে নাকি তার ডিউটি। দেরিতে ঘুম থেকে উঠল। রেডি হতে হতে সাড়ে আটটা বেজে গেল। অমনিতেই মেজাজ খারাপ করল সে। তড়িঘড়ি করে কেকটা মুখে পুরল, কফির কাপে দু'এক চুমুক দিল। দরজার বাইরে গিয়ে জুতার স্ট্যান্ডে জুতাজোড়া খুঁজে পেল না। ঝাঁঝিয়ে উঠল– আমার জুতা গেল কোথায়? এখান থেকে জুতা সরাও কেন? তার বলার ভঙ্গি আমার ভেতরটা জ্বালিয়ে দিল। পরে জুতাটা পাওয়া গেল তার ব্যাগে, কাগজ জড়ানো। আগের রাতে অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আর জুতো পরেনি, স্যান্ডেল পরেই বাড়ি ফিরেছিল। বল, আমার কী দোষ!'

'আমি কোথায় ছিলাম তখন?'

'তুমি মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছিলে।'

চিত্তরঞ্জনবাবু ম্লানমুখে মাথা নত করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'দেখ, এখন আমার তেষট্টি, তোমার ছাপ্পান্ন। আমরা বাইরেটাইরে তেমন যাই না। মানুষের সঙ্গে যে কথা বলব, সেটা হয়ে ওঠে না আমাদের। আমাদের যত কথা ওই অর্ণবের সঙ্গেই। ওকে ঘিরেই তো আমাদের সকল বাৎসল্য। সকালে বেরিয়ে যায় সে, রাতে ফেরে। তার সঙ্গে সুখ-দুঃখের দু'চারটি কথা বলার জন্য মুখিয়ে থাকি আমি। আগে চাকরি করতাম। নানা মানুষের সঙ্গে কথাবার্তায় দিন কেটে যেত। এখন তো আর সে সুযোগ নেই। তুমি গোটাদিন রান্নাবান্নায় ব্যস্ত থাক। আমি এঘর ওঘর ঘুরি, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। কিন্তু কাঁহাতক। একাকিত্ব পেয়ে বসে আমাকে। আমি ছটফট করতে থাকি। সন্ধ্যায় তুমি বস টিভি নিয়ে। একের পর এক সিরিয়ালে মশগুল হও তুমি। ওগুলোতে আমার রুচি লাগে না। বই নিয়ে বসি। কিন্তু কতক্ষণ পড়া যায় বল।' একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন চিত্তরঞ্জনবাবু। তারপর বললেন, 'অর্ণবের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি গভীর আগ্রহ নিয়ে। ও আসে। স্নানঘরে ঢোকে। এগারোটা বেজে যায়। আমারও ঝিমুনি আসে। আমি শোবার ঘরে যাই।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সুপ্রভা বললেন, 'কেন, মাঝেমধ্যে তো দুই বাপেবেটাকে কথা বলতে দেখি।'

'দেখ বটে, কিন্তু আগের অর্ণবকে খুঁজে পাই না। বেশিরভাগ প্রশ্ন করি আমি, হুঁ হ্যাঁ করে সে উত্তর দেয়। মোবাইলই টিপতে থাকে সারাক্ষণ। আমি উদ্যম হারাই। চুপচাপ বসে থাকি তার পাশে।' চিত্তরঞ্জনবাবু বলেন।

'ও তো এরকম ছিল না। দুজনে ড্রইংরুমে বসে জম্পেশ আড্ডা দিতে। মাঝে মাঝে ওর হো হো হাসির শব্দে রান্নাঘর থেকে দৌড়ে আসতাম আমি।'

'সেই অর্ণব কোথায় যেন হারিয়ে গেল। আমার সঙ্গে কথা বলতে তার যত কষ্ট। কষ্ট বলছি কেন, বিরক্তি বলাই ভালো। কোনো একটা জিনিস জানতে চাইলে একবারের ওপর দুবার বলতে চায় না। সেদিন জিজ্ঞেস করলাম– পুরুষের তুলনায় নারীদের মস্তিষ্ক নাকি ছোট? তোমাদের ডাক্তারিবিদ্যা কী বলে? প্রথমে সে আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রয়োজনই বোধ করল না। দ্বিতীয়বারে বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল। অথচ, অথচ এমন দিনও গেছে– লব-কুশ রাবণের ছেলে না রামের ছেলে, সীতার প্রতি রামের গভীর সন্দেহ ছিল না বিশ্বাস ছিল– এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছে আমাদের মধ্যে। আমি যতই বলেছি– রামের ঔরসেই জন্ম লব-কুশের, অর্ণব যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছে আমায়– তাই যদি হয়, তাহলে চৌদ্দ বছরের বনবাসকালীন সময়ে সীতার বাচ্চা হল না কেন, সীতা গর্ভবতী হল লঙ্কার কারাবাস শেষ করে। রাবণ তো ভীষণ নারীলোলুপ ছিল। বাল্মীকির রামায়ণেই আছে– সীতাকে হরণ করে প্রথম দিন নিজ রাজপ্রাসাদেই নিয়ে গিয়েছিল রাবণ, রাজপ্রাসাদ থেকে সবাইকে বের করে দিয়েছিল। তারপর একান্তে একরাত কাটিয়েছিল সীতার সঙ্গে।'

সুপ্রভা বিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'এসব কী বলছ তুমি?'

হাসতে হাসতে চিত্তরঞ্জন বললেন, 'তোমার ছেলে ঠিকই বলেছে। একরাত পর অশোকবনে স্থানান্তর করেছিল সীতাকে। এছাড়া আরেকটা ব্যাপার ভাববার আছে। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ যখন বনবাসে যাচ্ছেন, তখন ওঁরা যুবক-যুবতী। পঞ্চবটী বনে পর্ণকুটিরের অভ্যন্তরে থাকতেন রাম-সীতা আর লক্ষ্মণ বাইরে দাঁড়িয়ে-বসে তাদের পাহারা দিতেন। দিনের বেলায় যা-ই হোক, রাতের বেলায় তো বটেই। অশোকবনে সীতার অল্প সময় কেটেছে, বেশিরভাগ সময় কেটেছে তো পঞ্চবটী বনে, রাম-সংসর্গে। তো ওই সময়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কোনো বাচ্চা হল না সীতার, বাচ্চা হল লঙ্কা থেকে ফিরে। চিন্তার বিষয় না ব্যাপারটা?'

'ঠাকুর ঠাকুর! এসব কী বলছ তুমি? বলছিলে তো ছেলের কথা।' তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন সুপ্রভা।

'বিষয় থেকে একটু দূরে চলে এলাম। বলছিলাম– তোমার ছেলের সঙ্গ দেওয়ার কথা। বড় নিঃসঙ্গতায় ভুগি আমি। কথা বলার কাউকে পাই না।' বললেন চিত্তরঞ্জনবাবু।

'শুনেছি, মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে তার আশেপাশে কেউ থাকে না। ঘরভর্তি সবাই আছে অথচ কেউ নেই। কেউ নেই মানে কথা বলার কেউ নেই। সবাই এড়িয়ে চলে।' সুপ্রভা বললেন।

চিত্তরঞ্জনবাবু বললেন, 'যেমন এড়িয়ে চলছে অর্ণব।'

'এখনো আমাদের কত বয়স বাকি। তেমন করে বুড়ো হইনি আমরা। চলতে ফিরতে পারি। আমি রান্নাবান্না করি, তুমি দিব্যি হেঁটে-চলে বাজারটাজার করে আন। তো এই বয়সেই এই রকম। বার্ধক্যে কী হবে কে জানে! তুমি যদি আমার আগে যাও।' সুপ্রভা বললেন।

'আমি আগে গেলে তোমার তেমন অসুবিধা হবে না। ছেলের সংসারে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। তোমাদের সহিষ্ণুতা বেশি। অবহেলা সয়ে নিতে পার তোমরা। আমাকে তো চল্লিশ বছর ধরে দেখছ তুমি। আর সব সইতে পারি, তুচ্ছতাচ্ছিল্য নয়। কিন্তু আমার আগে যদি তুমি চলে যাও, কী হবে আমার কে জানে! সন্ন্যাসী হয়ে মঠে-মন্দিরে আশ্রয় নিতে হয় কিনা, বুঝতে পারছি না।' বললেন চিত্তরঞ্জনবাবু।

'তুমি ওভাবে ভাবছ কেন? তোমার তো টাকা থাকবে, এই বাড়িটা থাকবে। একটা গতি হয়ে যাবে।' বলেই হঠাৎ ডানে বাঁয়ে মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন সুপ্রভা। 'ঠাকুর, ঠাকুর। এসব কী বলছি আমি! অর্ণব কখনো ওরকম হবে না। বুড়ো বয়সে আমাদের অবহেলা করবে না কখনো। ও তো আমার স্বপ্নসন্তান। দুজন সন্তান মারা যাবার পরে সে আমার কোলজুড়ে এসেছে। জ্বরে-অসুখে কত রাত জেগেছি আমরা! তা কি কখনো ভোলার! আর তুমি যে তার প্রতি কী গভীর স্নেহ পোষণ কর, তা কি আমি জানি না! ওই যেদিন সে স্কুল থেকে রাত করে ফিরল, সেইদিন তো তুমি পাগলই হয়ে গিয়েছিলে প্রায়।'

চিত্তরঞ্জন বললেন, 'নাইনে পড়ত সে। স্কুল ছুটির পর সেলিম স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ত, ফিজিক্স। ছুটি হয়ে যেত পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সেদিন সাতটা বেজে যাওয়ার পরও ফিরল না। শ্রাবণ মাসই ছিল বোধ হয়। কী অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল, বজ্রপাত হচ্ছিল ভীষণ। ওই অবস্থাতেই বেরিয়ে গেলাম আমি। স্কুলের প্রতিটি আনাচকানাচ তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, সেলিম স্যারের বাসায় গেলাম। কোথায়ও পেলাম না। শেষ পর্যন্ত এক বন্ধুর বাসায় খুঁজে পেয়েছিলাম তাকে। দিব্যি নুডল্‌স খাচ্ছিল।'

'ফিরলে যখন, তোমাকে চেনা যাচ্ছিল না। জলে-কাদায় একাকার। টপটপ করে জল পড়ছিল গা থেকে। ছেলের মাথায় ছাতা ধরে নিজে ভিজতে ভিজতে বাসায় ফিরেছিলে। ওইদিন একটা কথা বলেছিলে অর্ণব সম্পর্কে।'

'কী?' চকিতে জিজ্ঞেস করলেন চিত্তরঞ্জনবাবু।

মাথা নিচু করে সুপ্রভা বললেন, 'দেখে নিও সুপ্রভা, তোমার ছেলে কোনোদিন দায়িত্বশীল হবে না।'

'কী জানি বাবা, এতদিনের কথা, মনে থাকার কথা নয়। তবে তোমার কথা শুনে ভাবছি– আমার ওইদিনের কথা সত্যি হতে যাচ্ছে কিনা।' বললেন চিত্তরঞ্জনবাবু।

সুপ্রভা এবার ধীরে ধীরে বললেন, 'ওর দিকটাও আমাদের একবার ভাবা দরকার। ইন্টার্নশিপ করতে গিয়ে কতজনের কথা শুনতে হয়। শুনেছি, আজকাল রোগীরাও নাকি হম্বিতম্বি করে, গায়েও নাকি হাত তোলে ডাক্তারদের। সবসময় তো মনমেজাজ ঠিক থাকার কথা নয়।'

'আমি ভাবছি অন্য। কোনো ব্যক্তিগত ক্রাইসিস হল না তো তার? এমন ক্রাইসিস, যা আমাদের বলতে পারছে না।'

'আমাকে না বলুক, তোমার সঙ্গে তো বন্ধুর সম্পর্ক তার।'

'ছিল। একদা বন্ধুর মতো সম্পর্ক ছিল। এখন নাই। বেশ দূরে দূরেই থাকে সে। অন্যমনস্ক। মোবাইলে মশগুল।' তারপর একটু থামলেন চিত্তরঞ্জনবাবু। বললেন, 'অর্ণবের কাছে আমাদের বৈষয়িক কোনো চাওয়ার বা পাওয়ার নেই। শুধু ভালোবাসাই পেতে চাই আমরা তার কাছ থেকে। তাও দিতে তার যেন ভীষণ অনীহা। অথচ একদা এক রাজপুত্র তার যৌবন ধার দিয়েছিল তার বুড়ো বাপকে।'

'যৌবন ধার দিয়েছিল!' বিস্মিত সুপ্রভা বললেন।

চিত্তরঞ্জন বললেন, "সত্যি, এক দুই বছরের জন্য নয়, সহস্র বছরের জন্য পুরু তার পিতা যযাতিকে যৌবন ধার দিয়েছিল। 'মহাভারতে'রই কাহিনী। যযাতি চন্দ্রবংশীয় রাজা। দুই স্ত্রী তাঁর, দেবযানী আর শর্মিষ্ঠা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দেবযানীর ঘরে দুই পুত্র। শর্মিষ্ঠার তিন ছেলে– দ্রুহ্য, অনু ও পুরু। শুক্রাচার্যের অভিশাপে একদা যযাতি জরাগ্রস্ত হলেন। কিন্তু তাঁর ভোগাকাঙ্ক্ষা তখনো শেষ হয়নি। পুত্রদের কাছে তিনি সহস্র বছরের জন্য যৌবন ধার চাইলেন। চারপুত্র রাজি হল না। কনিষ্ঠপুত্র পুরু কিন্তু রাজি হয়ে গেল। পিতাকে সহস্র বছরের জন্য নিজের যৌবন ধার দিয়ে পিতার জরাকে বরণ করে নিয়েছিল পুরু।"

'সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই। আজকাল যৌবন বদলাবদলির উপায় নেই। মানুষও আজকাল সহস্র বছর বাঁচে না। কিন্তু ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, আনুগত্য– এসব তো বদলাবদলি করা যায়?' বললেন সুপ্রভা।

চিত্তরঞ্জনবাবু করুণমুখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার ছেলের কাছে আমি, আমরা সহস্র বছরের যৌবন চাই না। আমরা চাই তার সঙ্গ, সুস্মিত কথা। চব্বিশটা ঘণ্টার অন্তত কিছুটা সে আমাদের দিক। এই তো আমাদের চাওয়া, তার কাছে।'

সুপ্রভা বললেন, 'তুমি ভেঙে পড় না। দেখে নিও, একদিন না একদিন আমরা আগের অর্ণবকে ফিরে পাব।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যমুনাজলে বিবর সন্ধান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যমুনাজলে নৌকাটি ভাসছে।

তীর ঘেঁষেই নৌকাটি। এক গাছি শুকনো লতা দিয়ে তীরলগ্ন একটি গাছের শিকড়ের সঙ্গে নৌকাটি বাঁধা। একে নৌকা না বলে ডিঙি বলা ভালো। আকারে তেমন বড় নয়। চার-পাঁচজন আরোহী বসতে পারে মাত্র। কিশোরী-নৌকাটি আপন ছন্দে নাচছে। এদিককার যমুনাজল নীল। জলতরঙ্গগুলো ছলাৎ ছলাৎ করে তীরভূমিতে আছড়ে পড়ছে। আছড়ে পড়ার শব্দ ঈষদুচ্চকিত। মৃদু তরঙ্গাঘাতেই নৌকাটি অল্প অল্প দুলছে।

নৌকার পাছার দিকে হাল ধরে বসে আছে এক কন্যা। উদ্ভিন্ন যৌবনা। রমণীর সকল রমণীয়তা তার সর্বাঙ্গ জুড়ে। যমুনাজলের মতোই ঘননীল তার চোখ দুটো। কন্যাটি অতিশয় সুন্দরী। মানুষ যে অর্থে সুন্দরী নারী বোঝে, এই নারী সে অর্থে সুন্দরী নয়। তার শরীরে গৌরবর্ণের আভাসটুকুও নেই। গৌরবর্ণীয় দুর্বলতাটুকু সৌন্দর্য নির্ধারণের মাপকাঠি হতে পারে না। যুবতীটির গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মা-কালীর মতোই তার দেহরং। সৌন্দর্য সম্পর্কে আদি-বিশ্বাসটুকু মন থেকে ঝেড়ে ফেলে কন্যাটির দিকে তাকালে যেকোনো বয়সের পুরুষের দৃষ্টি আটকে থাকবে ওই নারীর দেহে। তাকে দেখে মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহ চঞ্চল হয়ে উঠবেই।

নৌকায় বসা যুবতীটির দৃষ্টি অরণ্যবাহী পথের দিকে প্রসারিত। যদি কেউ আসে। এই ঘাটে আসার ওটাই একমাত্র পথ। এই নির্জনঘাটে কারও জন্য অপেক্ষা করছে সে। এই অপেক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনের।

কিন্তু দুপুর গড়িয়ে গেল, এখনো পর্যন্ত কেউ এল না।

সন্ধ্যা নামতে এখনো দেরি আছে। গোধূলির হলদে আলো সবেমাত্র নীল যমুনাজলের ওপর ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। শুধু যমুনাজলে কেন, সবুজ অরণ্যভূমির ওপর, পাহাড় থেকে সাপের মতো আঁকাবাঁকাভাবে নেমে আসা পথের ওপর, সর্বোপরি নৌকায় বসে থাকা রমণীর চিকনকালো দেহের ওপর গোধূলি তার আপন রং ছড়িয়ে যাচ্ছে। নৌকার প্রান্তভাগে স্থির হয়ে বসা নারীটিকে চিত্রার্পিত মূর্তির মতো মনে হচ্ছে। তার কেশরাশি মাথার ওপরে চূড়া করে বাঁধা। দেখে মনে হচ্ছে, ঘোর অমাবস্যা ওই কেশরাশির মধ্যে বন্দি হয়ে আছে। তার ঈষৎ ঝুলানো ওষ্ঠাধরে এমন একটা হাসি মৃদু খেলা করছে, যা দেখলে সাধারণ মানুষ তো কোন ছার, মুনিঋষিরও ধ্যানী মন টলে যাবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রমণীর পুরুষ্ট স্তনযুগল ছোট একটি বস্ত্রখণ্ডে ঢাকা। ওই বস্ত্রখণ্ডটি পৃষ্ঠদেশের একটি সূত্রগ্রন্থির সঙ্গে নিবদ্ধ। নারীটির অধমাঙ্গের বস্ত্র প্রয়োজনের তুলনায় কম। উরু ছাড়িয়ে সামান্য নিচে এসে বস্ত্রটির দৈর্ঘ্য ফুরিয়ে গেছে। নৌকাটির পশ্চাদ্‌ভাগে পা দুটোকে সামান্য ছড়িয়ে দিয়ে বসেছে সে। তাতে তার উরু, মোহনীয় চরণ দুটো প্রায় অনাবৃত ও দৃশ্যমান। নারীটির এই অনাবরণ দেহাংশ চতুর্দিকের পরিবেশে লাবণ্যের সঞ্চার করছে। ইচ্ছে করে নারীটি এরকম সাজপোশাক পরেনি বা এরকম লোভনীয় ভাবে বসেনি। এটা তার সমাজে স্বাভাবিক এবং প্রচলিত।

তার স্বল্প বসন, তার অনাবৃত দেহ তার সমাজে যতই স্বাভাবিক হোক না কেন, অন্য সমাজের মানুষের কাছে তা অসহনীয়। নারীটির সমাজে এটা একটা সহজ সরল আচার, কিন্তু তার সমাজবহির্ভূত মানুষের কাছে রিরংসা-উদ্রেককারী। নীল ঊর্মিমুখর যমুনার জল, তার ওপর মোহিনী এই যুবতী, দুটোকে একসঙ্গে অবলোকন করে যেকোনো ঋষি তাঁর সারাজীবনের বৈরাগ্যসাধনা বিসর্জন দিতে তিলার্ধ বিলম্ব করবেন না। এই নারীটির অধিকার পেতে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দ্বিধা করবেন না তিনি।

হঠাৎ নদী-তীরবর্তী পাহাড়ের সর্পিল পথ বেয়ে একজন মানুষকে দ্রুত নেমে আসতে দেখা গেল। পুরুষটি দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত, জটাজুটধারী। নৌকাটির কাছে এলেন তিনি। শরীরটা শীর্ণ। দীর্ঘদিনের বৈরাগ্যসাধনার চিহ্ন সমস্ত দেহজুড়ে। চেহারায় ক্লান্তির প্রকাশ দেখা গেলেও চোখ দুটো তাঁর উজ্জ্বল। তাঁর সেই উজ্জ্বল চোখে অর্জিত জ্ঞানের নিবিড় উপস্থিতি লক্ষযোগ্য। একটা নির্দিষ্ট তপাশ্রমে বহু বছর সাধনা শেষ করে হয়তো তিনি তীর্থদর্শনে বের হয়েছেন। হয়তো যমুনা পার হয়ে মথুরা বা শূরসেন রাজ্যের কোনো দেবক্ষেত্র দর্শনে যাবেন। অথবা যমুনার ওপারের মৎস্যদেশের কোনো তীর্থক্ষেত্র দর্শন করে নিজেকে আরও পবিত্রময় করে তুলবেন।

যমুনার এই অংশটি কিঞ্চিৎ সংকুচিত। জলধারা কম স্রোতময়। নদীর বুকজুড়ে এখানে ওখানে চর। দূরের একটা চর বৃক্ষময়। ওই চরের পাশ ঘেঁষেই ওপারে যেতে হবে। এই অঞ্চল দিয়ে নদী পারাপারের জন্য লোক আসে। এদিক দিয়ে পারাপারে সময় লাগে কম, তাই নদীর এই অংশটিই পারার্থীদের পছন্দ। পরিশ্রম কম লাগে বলে নৌবাহকেরও পছন্দ এই অঞ্চলটি। সবসময় একজন পুরুষই নৌকা পারাপার করে, আজকে তার জায়গায় বসে আছে এই উদ্ভিন্ন যৌবনা রমণীটি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নৌকার কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালেন ঋষি। তাঁর দৃষ্টি সামনে প্রসারিত। এমনিতে ঘাটে পৌঁছতে তাঁর দেরি হয়ে গেছে। দ্রুত পায়ে হেঁটে আসার জন্য হাঁপ ধরে গেছে তাঁর। চোখে-কপালে ক্লান্তির উপস্থিতি। আর সমস্ত দেহজুড়ে ক্লান্তি-অবসন্নতা তো আছেই। কিন্তু সামনে তাকিয়ে ঋষির দেহমন থেকে ত্বরিত সমস্ত ক্লিষ্টতা উধাও হয়ে গেল। তিনি দেখলেন– নিকষকৃষ্ণ রমণীটির সর্বাঙ্গ ঘিরে গোধূলির আলো এক অপূর্ব মায়ার সৃষ্টি করে চলেছে। যমুনাজলকে উদ্ভাসিত করে নারীটির নগ্ন পায়ে অস্তরাগ লুটোপুটি খাচ্ছে। ঋষি ক্ষণকাল তাঁর অতীতকে ভুললেন। তিনি নদীর সৌন্দর্যে, পর্বত-অরণ্যের রূপে এবং নৌকায় বসা নারীটির অঙ্গসৌষ্ঠবে মোহিত হলেন। এক অবর্ণনীয় শিহরণ তাঁর শিরায় উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ল। তিনি কামার্ত হলেন। এক দুর্দমনীয় আসঙ্গলিপ্সা তাঁর মনে জেগে উঠল। তিনি বিচক্ষণ। মনের কামনা মনেই চেপে রাখলেন তিনি। মানসিক বিকারকে দমন করে রাখার শক্তি তাঁর আছে। তিনি নিজের রিরংসাকে সংযত করলেন।

মুনি নারীটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সুতন্বী, তুমি কে? এখানে যে লোকটি পারাপার করত, সে কোথায়? ও আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত নাইয়া।'

তন্বী করজোড়ে বলল, 'প্রণিপাত ঋষিবর। যিনি নৌপারাপার করতেন, তিনি আমার বাবা। বাবার বয়স হয়ে গেছে। নৌপারাপারে শক্তির প্রয়োজন। পিতা আজ শক্তিহীন। তাঁর কোনো পুত্রসন্তান নেই। তাই নৌচালানোর দায়িত্ব আমার ওপর পড়েছে। আপনি নৌকায় চরণ রাখুন।'

মুনিবর মেয়েটির গুছানো কথা শুনে মুগ্ধ হলেন। বললেন, 'বাঃ, তুমি তো বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পার।' বলতে বলতে নৌকায় উঠে বসলেন তিনি। মুগ্ধ চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মুনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি তন্বী?'

মেয়েটির মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল। বলল, 'আপনি তো আমার একটা নাম দিয়েই দিয়েছেন, তন্বী। ও নামেই না হয় ডাকুন আমাকে।'

'তুমি তো বেশ বুদ্ধিমতী দেখছি। আমার কথা দিয়ে আমাকে জব্দ করলে হে।'

'অপরাধ নেবেন না মুনিবর। আমি যদি আপনার রাগের কারণ হই ক্ষমা করুন।'

মৃদু হেসে ঋষি বললেন, 'অপরাধের কিছু বলনি তুমি। সন্ত্রস্ত হয়ো না।' একটু থেমে আবার বললেন, 'তোমার নামটি কি বলবে এবার?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মুনিবরের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তন্বী বলল, 'সূর্যদেব পশ্চিমে একেবারে ঢলে পড়েছে। পাহাড়ের ছায়া ঘন হয়ে আসছে। অবস্থা বুঝে মনে হচ্ছে আর কোনো পারার্থী আসবে না। তাছাড়া, আপনার হাঁটার গতি দেখে অনুমান করছি আপনারও তাড়া আছে। যদি অনুমতি করেন, নৌকা ছাড়ি।'

'অবশ্যই অবশ্যই।' তন্বীর বক্ষদেশে একপলক চোখ বুলিয়ে ঋষি বললেন।

তন্বী এক লাফে নৌকা থেকে নামল। তার নিতম্ব দুলে উঠল। গাছের শিকড় থেকে লতাটি খুলে দিল। উপুড় হয়ে নৌকাটিকে জলের দিকে ঠেলতে উদ্যত হল সে। এই সময় ঋষির চোখদুটো আটকে গেল তন্বীর পুষ্ট স্তনযুগলে। উপুড় হবার কারণে স্তনদুটো ভালোরকমে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল।

তন্বী নৌকায় উঠে হাল ধরল। নৌকা সামান্য এগিয়ে গেলে মেয়েটি নিচুস্বরে বলল, 'আমার নাম মৎস্যগন্ধা।'

'মৎস্যগন্ধা!' বিস্মিত চোখ মুনিবরের। 'এ কেমন নাম তোমার?'

'হ্যাঁ আমার নাম মৎস্যগন্ধা। আমার সমস্ত শরীরজুড়ে মাছের গন্ধ। বিদ্‌ঘুটে একটা মৎস্যগন্ধ সর্বদা আমাকে ঘিরে আছে।'

নিজের অজান্তে মুনিবরের ডান হাতটা নাকের কাছে চলে এল। বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনী দিয়ে নাকের অগ্রভাগে একবার ডলা দিলেন। তারপর জোরে একটা শ্বাস টানলেন। বললেন, 'কই, আমি তো কোনো মাছের গন্ধ পাচ্ছি না!'

এবার খলবল করে হেসে উঠল মৎস্যগন্ধা। হাসতে হাসতেই বলল, 'অতদূরে মাছের গন্ধ পাবেন কী করে আপনি? গন্ধ তো আমার গায়ে গায়ে। যারা অতি নিকটে আসে শুধু তারাই বুঝতে পারে আমার গায়ের দুর্গন্ধটি।'

মুনি কি এই সময় একটু লোভাতুর হয়ে উঠলেন, মৎস্যগন্ধার নিকটে যাওয়ার জন্য? বোঝার উপায় নেই। কারণ মুনি যেখানে বসে ছিলেন, সেখানেই বসে থাকলেন। তাঁর দেহ এক জায়গায় স্থির থাকলে কী হবে, মন তাঁর উড়ে গেল মৎস্যগন্ধার দেহসমীপে। দেহের চারিদিকে মধুকরের তৃষ্ণা নিয়ে মনটি তাঁর ঘুরতে লাগল ।

'কী ভাবছেন মুনিবর?' মৎস্যগন্ধা জিজ্ঞেস করল।

তাঁর এই মুহূর্তের ভাবনাটি যদি মৎস্যগন্ধার কাছে ব্যক্ত করেন, তাহলে লজ্জার অন্ত থাকবে না। নিজের মধ্যে নিজের মনকে লুকালেন তিনি। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলতে চাইলেন, 'এ রকম হল কেন?'

মৎস্যগন্ধা জিজ্ঞেস করল, 'কী রকম?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'মানে তোমার শরীর থেকে মাছের গন্ধ বের হয় কেন? স্বাভাবিক কোনো মানুষের শরীর থেকে তো মৎস্যগন্ধ বের হয় না। নিদেনপক্ষে ঘামের গন্ধ বের হয়।'

'যদি অপরাধ না ধরেন মুনিবর, আপনার পরিচয়টা কি জানতে পারি?'

এবার মুনিবরের সমস্ত চোখমুখ জুড়ে প্রশান্ত একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ল। বললেন, 'নিতান্ত অল্পবয়স তোমার, তাই তুমি আমাকে চিনতে পারছ না। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ আমাকে চেনে। আমি পরাশর। মহর্ষি বশিষ্ঠের পৌত্র হিসেবে, বৈদিক ঋষি হিসেবে সমগ্র পৃথিবী আমাকে চেনে।' আস্তে আস্তে বললেন পরাশর।

হালধরা অবস্থাতেই মাথা নোয়াল মৎস্যগন্ধা। বলল, 'আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত গ্রহণ করুন ঋষিবর।' এরপর বলল, 'আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন আমার শরীর থেকে মাছের গন্ধ বের হয় কেন? এর উত্তর দেওয়ার আগে বলি, পিতার কাছে আপনার কীর্তির কথা শুনেছি। শুধু চোখে দেখিনি আগে।'

'হ্যাঁ, তাই তো। কেন বের হয়?' পরাশর মৎস্যগন্ধার শেষের কথাকে কানে না তুলে বললেন।

'আমার যে স্বাভাবিক জন্ম নয়।'

'মানে!'

'মানে আমার জন্ম কোনো নারীর গর্ভে হয়নি। অদ্রিকা নামের এক মৎস্যার গর্ভে আমার বড় হয়ে ওঠা।' নৌকাটি সামনের দিকে এগুতে থাকল। আস্তে আস্তে দাঁড় চালাতে চালাতে মৎস্যগন্ধা তার জন্ম ইতিহাস বলে গেল।

চেদিরাজ উপরিচর বসু। মহিষী গিরিকা। পিতৃযজ্ঞের কারণে মৃগয়ায় যেতে হল রাজাকে। কিন্তু মৃগয়ায় মন বসে না রাজার। প্রাসাদে অপেক্ষমাণ সুন্দরী গিরিকার কথাই বারবার মনে পড়ছে তাঁর। রাজা রতিলিপ্সু হয়ে পড়লেন। কিন্তু স্ত্রী তো স্পর্শের বাইরে, রাজপ্রাসাদে। মন সংযমের বাঁধ মানল না। রতিপাত হল রাজার। সেই বীর্য পত্রপুটে করে বাজপাখির পায়ে বেঁধে মহিষীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন রাজা। আকাশপথে সেই পাখি অন্য একটা বাজপাখি দ্বারা আক্রান্ত হল। যমুনাজলে সেই শুক্রাণু পতিত হল। শাপগ্রস্ত মৎস্যরূপী স্বর্গঅপ্সরা সেই বীর্য খেয়ে গর্ভবতী হল। কালক্রমে সেই মৎস্য জেলেদের জালে ধরা পড়ল। ধীবররা সেই মৎস্যকে কাটতে গেলে পেট থেকে দুটো শিশু বেরিয়ে এল। একটি কন্যা, অন্যটি পুত্র। রাজা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উপরিচরের কাছে খবর গেলে তিনি পুত্রটিকে সাদরে গ্রহণ করলেন। কন্যাটিকে ত্যাগ করলেন।

গভীর আগ্রহে পরাশর জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর?'

'সেই পরিত্যক্ত কন্যাটিই আমি। মেয়ে বলে পিতার কাছে আমি গৃহীত হলাম না। পিতা হেলায় দাশরাজার কাছে আমাকে দিয়ে দিলেন। বললেন, 'দেখ ধীবররাজ, মেয়েটাকে বাঁচাতে পার কিনা।'

পরাশরের বিস্ময়ের শেষ নেই। তিনি বললেন, 'তারপর?'

'ধীবররাজ আমাকে সাদরে কোলে টেনে নিলেন। গভীর বাৎসল্যে আমাকে বড় করে তুললেন এই জেলেদম্পতি। নিজেরা খেয়ে না খেয়ে আমার ভরণপোষণ করে যেতে লাগলেন।'

'খেয়ে না খেয়ে কেন? এই না বললে ধীবররাজ। মানে তোমার পালকপিতা রাজা! তাঁর অভাব কিসের?' বললেন ঋষি।

এবার খিলখিল করে হেসে উঠল মৎস্যগন্ধা। বলল, 'আমার বাবা নামে রাজা, আসলে সাধারণ একজন জেলে। হ্যাঁ, অন্যান্য জেলের চেয়ে তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল। তাই পাড়াপড়শিরা তাঁকে দাশরাজা বলে সম্বোধন করত। রাজা বলতে আপনারা যা বোঝেন, আমার বাবা সেরকম ছিলেন না। দরিদ্র জেলেদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে উচ্চবিত্তের ছিলেন।'

'তাও যদি হয়, তারপরও তো খাওয়াপরার অভাব হবার কথা নয় তোমার বাবার।' পরাশর বললেন।

মৎস্যগন্ধা করুণ কণ্ঠে বলল, 'যথার্থ বলেছেন ঋষি। অভাব ছিল না বাবার ঘরে। কিন্তু একটা দুর্ঘটনায় অভাবে পড়তে হল তাঁকে।'

'দুর্ঘটনা!' বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন মুনি।

'হ্যাঁ, দুর্ঘটনা। একবার প্রবল বৃষ্টিপাত হল এই অঞ্চলে। আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন পাহাড়ি অঞ্চল এটা। বৃষ্টির দরুন প্রবল ঢল নামল পাহাড় থেকে। শান্ত যমুনা রাক্ষুসি যমুনা হয়ে উঠল। প্রচুর জল, প্রবল স্রোত। ওই সময় নদীতে বাবার দু'দুটো নৌকা মাছ ধরায় ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ করালগ্রাসী বন্যার তোড়ে নৌকাজাল যে কোথায় ভেসে গেল, হদিস মিলল না। বাবা কোনোরকমে প্রাণে বাঁচলেন। সঙ্গী জেলেদের কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না। সেই থেকে বাবা দিনে এনে দিন খাওয়া মানুষ। বেঁচে থাকার জন্য এই পারানির কাজ। আগেই বলেছি আপনাকে, বাবা এখন বয়োবৃদ্ধ। শক্তিতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কুলিয়ে উঠতে পারেন না এখন। তাই আমাকে করতে হচ্ছে নৌবাহনের কাজ।' একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মৎস্যগন্ধার বুক চিরে।

এ তো প্রকৃতির অভিশাপ। প্রকৃতির অভিশাপে মৎস্যগন্ধার পিতা সর্বস্বান্ত হয়েছে। তাতে মানুষের হাত নেই। সব হারানোর কাহিনী শুনে মনে বেদনা জাগতে পারে শুধু। পরাশরের মনেও তা-ই জাগল। পরাশর ক্রোধ এবং বেদনাকে সংবরণ করতে জানেন। খেয়াতরীতে বসে মৎস্যগন্ধার দিকে তাকিয়ে তাঁর বেদনা প্রশমিত হল। বেদনার পর জাগল বাৎসল্য। বাৎসল্যের জায়গায় ধীরে ধীরে এক অপূর্বস্বাদিত শিহরণ উৎপন্ন হতে শুরু করল। মুনি মৎস্যগন্ধার যৌবনোদ্ভেদ নিরীক্ষণ করে পুলকিত হতে থাকলেন। মৎস্যগন্ধার কালো দেহরূপের মধ্যে কমনীয় আলোর সন্ধান পেলেন।

পরাশর বললেন, 'আমি তোমার দিনশেষের শেষযাত্রী বাসবী। আমাকে একটু দ্রুত ওপারে নিয়ে চল।'

মৎস্যগন্ধা চকিতে চোখ তুলে তাকাল পরাশর মুনির দিকে। বাসবী কেন? মুনির মুখে এই অশ্রুতপূর্ব সম্বোধনটি শুনে মৎস্যগন্ধার হাতের বৈঠাখানি থেমে গেল। বাসবী নামের রহস্য সে জানে। এই সম্বোধন ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত। অদ্ভুত এক ভঙ্গি করে সে মুনির দিকে তাকাল। এই ভঙ্গিমায় মৎস্যগন্ধার কোনো অভিসন্ধি নেই। এটা তার সহজাত ভঙ্গিমা। শুধু মুনির দিকে কেন, সবার দিকে বিস্ময়ের সময় ঠিক এই ভঙ্গিতে তাকায় সে। মুনি ভাবলেন অন্যকিছু। কৃষ্ণা রমণীর শারীরিক বিভঙ্গের দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তিনি।

এইসময় মৎস্যগন্ধা গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'নারী আমি। আমার পেশিতে জোরই বা কতটুকু। দ্রুত বাইতে তো শক্তি লাগে।'

পরাশর মৎস্যগন্ধার পেলব বাহুর দিকে চোখ রেখে বললেন, 'তুমি আমাকে ভুল বুঝ না স্নিগ্ধা। ওপারে যাবার তাড়া আমার। দ্রুত সন্ধ্যা নামছে। তাই তাড়া দিয়েছি আমি। ভুল হয়ে গেছে আমার। তুমি তোমার সাধ্যমতো বাও।'

মৎস্যগন্ধা ভাবল– যে পরাশর মুনির ক্রোধ জগদ্বিখ্যাত, যিনি মিষ্টি কথায় জগৎ ভুলাতে শিখেননি, বেদ-পুরাণ-বেদান্ত পড়ে পড়ে যার ভেতর থেকে লোকজ আবেগ তিরোহিত হয়ে গেছে, যিনি ঈশ্বর সাধনাকেই জীবনের সারার্থ বলে মনে করেন, তার কণ্ঠে একী উচ্চারণ! বাসবী, স্নিগ্ধা, ভুল বুঝ না– এসব কথাবার্তা

কোনো রহস্য [illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনুসন্ধিৎসু চোখে পরাশরের দিকে তাকাল মৎস্যগন্ধা। দেখল– মুনিবরের চোখে কী রকম একটা গাঢ় আভা। ও চোখে ক্রোধ নেই, বিরক্তি নেই, প্রথম দেখার ক্লান্তি নেই। কী রকম যেন অদ্ভুত এক চাহনি। সেই চাহনির অর্থ কি মৎস্যগন্ধা অনুমান করতে পারছে? মৎস্যগন্ধা নারী। সুতরাং এরকম পুরুষ-চাহনির অর্থ যে সে একেবারে বুঝতে পারছে না, এমন নয়। সে লজ্জায় মাথা নিচু করল। মৃদু একটা কম্পন সে নিজের মধ্যে অনুভব করতে লাগল।

এই সময় পরাশরের স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠ মৎস্যগন্ধার কানে ভেসে এল, 'বাসবী, আমি তোমার সঙ্গে মিলন প্রার্থনা করছি।'

বিভ্রান্ত চোখে মৎস্যগন্ধা মুনিবর পরাশরের দিকে তাকাল। তাঁর হঠাৎ প্রস্তাবে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সে। মুনির প্রস্তাবটি বজ্রাঘাত তুল্য না নিতান্ত শ্রুতিসুখকর বুঝতে পারল না মৎস্যগন্ধা। একটা অব্যক্ত বিভোরতা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। তার যে এই এত বয়স, কোনো পুরুষ তাকে এরকম করে প্রার্থনা করেনি আগে। তার দেহের ওপর যৌবন আলো ফেলেছে, দিনে দিনে তার নারী অঙ্গগুলো পুষ্ট হয়ে উঠেছে, কিন্তু কেউ তার দিকে তেমন করে ফিরে তাকায়নি। বলেনি, 'মৎস্যগন্ধা, তুমি অতীব সুন্দরী, আমি তোমার সঙ্গ চাই।' চাইবে কী করে? সে তো নিতান্ত কালাকোলা এক ধীবরকন্যা, তার সমস্ত শরীর জুড়ে যে তীব্র মৎস্যগন্ধ। এই মুনি যতই হাড্ডিসার হোন, যত অধিক হোক তাঁর বয়স, তাকে তো যথামর্যাদায় প্রার্থনা করল। এ তো তার পরম পাওয়া। হঠাৎ জোরে মাথা ঝাঁকাল মৎস্যগন্ধা। ছিঃ! এসব কী ভাবছে সে? সে না দাশরাজার কন্যা? তার না সমাজ আছে? তাকে ঘিরে না তার মা-বাবার স্বপ্ন-সাধ আছে? সর্বোপরি আছে তার কুমারীত্ব। মুনি-সংসর্গে তার কুমারীত্ব বিসর্জিত হবে। গোটাটা জীবন অশুচিময়তার মধ্যে যাপন করে যেতে হবে তাকে। এই মুনি তো তাকে চিরসঙ্গিনী করে নিয়ে যাবেন না। রতিক্রিয়া সম্পন্ন করে হেলায় ফেলে চলে যাবেন। মুনির কাছে সে ক্ষণিক উত্তেজনার ব্যবহার্য বস্তু ছাড়া তো বাড়তি কিছুই নয়? মুনির ক্ষণিক চিত্তচাঞ্চল্যে ধরা দেওয়া তার উচিত হবে না। কিন্তু ধরা না দিলে মুনি যদি অভিশাপ দেন? যদি 'নরকের কীট হয়ে পরবর্তীকালটা কাটাও তুমি'– এরকম কিছু একটা অভিশাপ দেন? কী হবে তখন?

এইসময় পরাশরের কণ্ঠ আবার শুনতে পেল সে, 'তুমি দ্বিধায় পড়েছ, তাই না মৎস্যগন্ধা। একদিকে তোমার কুমারীত্ব, তোমার সমাজ, তোমার পিতামাতা, তোমার ভবিষ্যৎ জীবন, অন্যদিকে মুনির প্রার্থনা। সেই প্রার্থনার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে তোমার শিহরণ বাসনাও যুক্ত। কোনটাকে মেনে নেবে তুমি? তোমার কুমারীত্বকে মূল্য দেবে, না আমার প্রার্থনাকে গ্রহণ করবে? আমি বলি কি...।' অর্ধপথে কথা থামিয়ে দিলেন মুনি।

চকিতে পরাশরের দিকে তাকাল মৎস্যগন্ধা। কোনো কথা বলল না।

'বলি, আমাকে একটা পুত্র দান কর তুমি। তোমার মাধ্যমে আমি আমার পিতৃঋণ শোধ করতে চাই। যুগান্তরে বিস্তৃত হতে চাই।' রমণীর সঙ্গে শারীরিক মিলনের পূর্বে পুরুষের মধ্যে যে বাঁধভাঙা কামনা উদগ্র হয়ে ওঠে, সেরকম কোনো চিহ্ন পরাশরের দেহভঙ্গিতে বা কথায় নেই।

মৎস্যগন্ধা নিজের ভেতরে চোখ রাখল। তার ভেতরটা কী বলে? তার ষোড়শীহৃদয় বলছে– অনাস্বাদিত এই স্বাদ গ্রহণ করতে তোমার আপত্তি কেন মৎস্যগন্ধা? অবর্ণনীয় নিবিড় শিহরণ এতে। এক গহিনগভীর আনন্দ জড়িয়ে আছে এই শিহরণে। ফিরিয়ে দিও না তুমি মুনিকে। গ্রহণ কর তাকে। তাতে মুনির তৃপ্তি, তোমার পরমানন্দ।

'কিন্তু আমার কুমারীত্ব?' মনকে প্রশ্ন করল সে। সেই প্রশ্ন গলা দিয়ে শব্দ হয়ে বেরিয়ে এল। মুনির শ্রবণেন্দ্রিয় পর্যন্ত পৌঁছে গেল মৎস্যগন্ধার প্রশ্ন।

পরাশর মনে করলেন– প্রশ্নটি তাঁকেই করা হয়েছে। স্মিতকণ্ঠে বললেন, 'তুমি ভয় পেও না নারী। আমার আশীর্বাদে তোমার কুমারীত্ব অটুট থাকবে। সন্তান প্রসবের কোনো চিহ্ন তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে থাকবে না।'

'তা কী করে হয়? সন্তান হবে অথচ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথাপূর্ব থাকবে? আপনার আসঙ্গলিপ্সা মিটাব অথচ আমার কুমারীত্ব বজায় থাকবে?' লজ্জার মাথা খেয়ে প্রশ্নগুলো করল মৎস্যগন্ধা।

'ঋষি আমি। বশিষ্ঠ আমার পিতামহ। আমি আমার ঋষিত্বের দোহাই দিয়ে বলছি– আমার আশীর্বাদে তোমার কুমারীত্ব যথাযথ থাকবে। আমার সঙ্গে মিলনের পরও তুমি অপবিত্র হবে না। শুধু তাই নয়.....।' বসা থেকে উঠতে উঠতে পরাশর বললেন, 'শুধু তাই নয়, আমাকে তৃপ্তি দেওয়ার ফলে তোমার ভবিষৎ জীবন রাজকীয় হবে।'

'রাজকীয় হবে!' মৎস্যগন্ধার অবিশ্বাসী কণ্ঠ।

'হ্যাঁ, রাজকীয় হবে। এই ভারতবর্ষের বিখ্যাত এক রাজার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। বিপুল মর্যাদায় সেই রাজা তোমাকে প্রধান মহিষী করে তার রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবে।' মৎস্যগন্ধার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতে বসতে পরাশর বললেন,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মৎস্যগন্ধা সংকুচিত হয়ে নৌকার কাছা ঘেঁষে বসল। বলল, 'আমি নিম্নবর্ণের সামান্য এক নারী। আপনি ব্রাহ্মণ, সমাজে নমস্য। একজন দাশনারীতে উপগত হওয়া আপনার শোভা পায় না।'

'বাসনার কাছে উঁচু আর নিচু বলে কিছু নেই। তোমাকে আমার বাসনা পূরণের অনুষঙ্গ বলে মনে হয়েছে, তাই তোমাকে কামনা করছি। তুমি ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের কথা বললে। শাস্ত্রে আছে—ব্রাহ্মণ যে কোনো বর্ণের নারীতে উপগত হতে পারে। তুমি আমাকে বিমুখ কর না বাসবী।' মৎস্যগন্ধাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে ধরতে বললেন পরাশর।

মৎস্যগন্ধা শেষ চেষ্টা করল। মুনির জড়িয়ে ধরা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'মৎস্যগন্ধা আমি। আমার সমস্ত শরীর জুড়ে মাছের উৎকট গন্ধ। আমার সঙ্গে মিলনে আপনার ব্রাহ্মণত্ব কলুষিত হবে।'

এবার অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন পরাশর। বললেন, 'ব্রাহ্মণত্ব এত ঠুনকো জিনিস নয় যে, তোমার মতো এক নারীর সান্নিধ্যে তা কলুষিত হবে। তুমি নির্বিঘ্ন থাক।' তারপর কামাসক্ত চোখে মৎস্যগন্ধার দিকে তাকিয়ে পরাশর বললেন, 'আমি আশীর্বাদ করছি– তোমার শরীরে আর মাছের গন্ধ থাকবে না। আজ থেকে তোমার শরীর থেকে পুষ্পগন্ধ বের হবে। যোজনপথ দূর পর্যন্ত তোমার শরীরের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়বে। আজ থেকে তুমি পুষ্পগন্ধা।'

'পুষ্পগন্ধা! যোজন পথ দূর থেকে!' মৎস্যগন্ধার গলা দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে এল।

'আমার সঙ্গে মিলনে তোমার কোনো পাপ হবে না। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে সত্যবতী নামে খ্যাতি লাভ করবে তুমি।' বলতে বলতে মৎস্যগন্ধাকে জাপটে ধরলেন পরাশর। নৌকার অপরিসর পাটাতনে মৎস্যগন্ধাকে শুইয়ে দিলেন। মৎস্যগন্ধা নিজেকে মুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-পৌরুষের সঙ্গে একজন নারী পেরে উঠবে কেন?

স্রোতের টানে এবং বাতাসের তাড়নায় নৌকাটি একটা সময়ে ওপারে ভিড়ল। মৎস্যগন্ধার দিকে এক পলক তাকিয়ে নদীপারে পা রাখলেন পরাশর মুনি। যাওয়ার আগে নৌকাটিকে মাঝ-যমুনার দিকে ঠেলে দিলেন।

নৌকার পাটাতনে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে মৎস্যগন্ধা। নিষ্পলক চোখ দুটি ঊর্ধ্বাকাশে স্থির। আঁধার ঘনায়মান। আকাশের এদিক থেকে ওদিকে পাখিরা উড়ে যাচ্ছে।

নৌকাটি যমুনাজলে বৃত্তাকারে ঘুরে যাচ্ছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্যর্থ কাম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খুব 'মহাভারত' পড়েন ধরণীবাবু।

আগে পড়তেন কাহিনীর টানে, এখন পড়েন জীবনের অন্তর্গূঢ় রহস্যের উত্তর খোঁজার বাসনায়। ধরণীবাবুর পুরো নাম ধরণীপ্রসাদ চক্রবর্তী। এখন তেষট্টি। চাকরি করতেন একটা বেসরকারি ব্যাংকে, অ্যাকাউন্টস সেকশনের প্রধান ছিলেন। পঞ্চান্নতে চাকরি ছাড়েন। মানে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন। হিসেবের গোলমালের কারণে সাসপেন্ড হবার আগেই চাকরি থেকে অব্যাহতি নেন চক্রবর্তীবাবু। অব্যাহতি নেওয়ার আগে সেলিম সাহেবকে ফাঁসিয়ে যান। সেলিম জাহিদকে দীর্ঘ চার বছর ব্যাংকের টাকা আত্মসাতের অপরাধে জেল খাটতে হয়েছে। সেলিম জাহিদ ধরণীবাবুর অধস্তন কর্মকর্তা ছিলেন না। ছিলেন ওই ব্যাংকের ম্যানেজার। তারপরও চক্রবর্তীবাবুর মারপ্যাঁচে কুপোকাত হয়েছিলেন সেলিম জাহিদ। জাহিদ সাহেব জেলে গেলে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক নিয়েছিলেন ধরণীবাবু। তদন্ত কমিটি সন্দেহের তর্জনী তাঁর দিকেও উঁচিয়ে ছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে জাহিদ সাহেব শাস্তি পেলেও ধরণীবাবু জানতেন, তাড়াতাড়ি বিদায় না নিলে অধিকতর তদন্তে, যদি হয় কখনও, তাঁকেও ফেঁসে যেতে হবে। জাহিদ সাহেবের সইটা তো তিনিই জাল করিয়েছিলেন।

নন্দনকানন গোলাপ সিংহ লেইনে বাড়ি তাঁর। চাকরি থাকতে থাকতেই বাড়ির ফাউন্ডেশন দিয়েছিলেন, চাকরি ছাড়ার পর কমপ্লিট করেছেন। টাইলস মোড়ানো ঝকঝকে আলিশান তেতলা বাড়ি। প্রতিবেশী আর পরিচিতরা চোখ ঠাটিয়েছিল। এতটাকা পেলেন কোথায় ধরণীবাবু! চাকরি থাকলে না হয় একটা কথা ছিল! বউও তো কোনো চাকরিবাকরি করেন না, গুপ্তধন পেয়েছেন নাকি? গুপ্তধন পেয়েছিলেন বৈকি ধরণীবাবু।

ম্যানেজার সেলিম জাহিদ সহজ সরল মানুষ ছিলেন। ধরণীবাবুকে বড় বিশ্বাস করতেন তিনি। আর তাঁর সইটাও ছিল সোজা, ব্যাংকের চেকে, কাগজপত্রে সে জাহিদ লিখতেন শুধু। সাধারণত কোনো ঊর্ধ্বতন পদের কর্মকর্তারা নিজেদের সই-স্বাক্ষর প্যাঁচালো করেন। অন্যরা যাতে স্বাক্ষর জাল করতে না পারে। সেলিম সাহেব তা করেননি। প্রথম দিকে ধরণীবাবু একবার বলেছিলেন, 'একটা কথা বলি স্যার, আপনার স্বাক্ষরটা বড়ই সোজা। যেকোনো সময় বিপদে পড়তে পারেন।'

সন্দিগ্ধ চোখে সেলিম জাহিদ ধরণীবাবুর দিকে তাকিয়ে থেকেছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর ফিক করে হেসে দিয়েছিলেন। ফিক করে মেয়েরা হাসে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পুরুষরা নয়। সেলিম সাহেব ফিক করেই হেসেছিলেন। কারণ তাঁর মধ্যে মেয়েলিভাবটা একটু বেশি। মেয়েদের মতো বোকাসোকাও ছিলেন তিনি। নইলে কেন ধরণীবাবুর আগাম সতর্কবাণী থেকে কোনো শিক্ষা নেননি? ধরণীবাবুর কথা থেকে তিনি যদি শিক্ষা নিতেন, স্বাক্ষরটা যদি জটিল করতেন, তাহলে তাঁকে জেলও খাটতে হতো না আর ধরণীবাবুর অর্থনৈতিক অবস্থা এ রকম বিস্ময়করভাবে পরিবর্তিতও হতো না।

সেদিন ধরণীবাবুর কথা শুনে সেলিম জাহিদ হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'অ্যাকাউন্টেন্ট-ক্যাশিয়ারের কারণেই ম্যানেজাররা বিপদে পড়ে, হিসাব শাখার প্রধান অসৎ হলে ম্যানেজারের বারোটা বাজে। আপনি একজন সৎলোক ধরণীবাবু। আপনি থাকতে আমি বিপদে পড়ব কেন?'

সেদিন আর কথা বাড়াননি ধরণীবাবু। 'তা তো বটেই, তা তো বটেই' বলতে বলতে সেলিম জাহিদের সামনে থেকে উঠে গিয়েছিলেন।

আনোয়ারার তৈলারদ্বীপ গ্রাম থেকে খালি হাতেই চট্টগ্রাম শহরে এসেছিলেন ধরণীবাবু। সম্বল শুধু বিকম পাসের সার্টিফিকেটটা আর চক্রবর্তী পদবিটা। বাপ ছিলেন পূজারি বামুন। এবাড়ি ওবাড়ি, এমন্দির ওমন্দিরে পুজো-আচ্চা করে সংসার চালাতেন। স্থাবর সম্পত্তি বলতে ওই বসতভিটেটাই। একটা মেয়ে ছিল, পাশের গাঁয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন। ছেলেটাকে বিকম পাস করিয়েছিলেন কষ্টেসৃষ্টে। তারপর টুপ করে মারা গিয়েছিলেন। আগেই বউটার স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটেছিল। ধরণীবাবু একেবারে একা হয়ে গিয়েছিলেন। গ্রামের বুড়ো হেডমাস্টারের পরামর্শে শহরে চলে এসেছিলেন। ব্যাংকের চাকরিটাও পেয়ে গিয়েছিলেন। তারপর এক দুইটা পদ অতিক্রম করে অ্যাকাউন্টেন্টের পদে থিতু হয়েছিলেন। বিয়ে করবার বছর কয়েক পরে বউ পরামর্শ দিয়েছিলেন– গাঁয়ের ভিটেটা রেখে লাভ কী? বেচে দিয়ে কিছু ক্যাশ টাকা হাতে নাও।

ধরণীবাবু বলেছিলেন, 'বল কী তুমি! জন্মভিটে বলে কথা। মা-বাবার গন্ধ আছে না ওই ভিটেয়!'

ধরণীবাবুর স্ত্রী বড় ঠাণ্ডামাথার মহিলা। বুদ্ধিও রাখেন বেশ। বলেছিলেন, 'তুমি তো আর তৈলারদ্বীপ ফিরে যাচ্ছ না। শহরেই তো থাকবে। শহরের মাটি এত মিঠা যে বুড়ো বয়সেও ফিরে যেতে ইচ্ছে করবে না। তাছাড়া....।' বলে থেমেছিলেন বউটি।

ধরণীবাবু জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন স্ত্রীর দিকে। বলেছিলেন, 'তাছাড়া?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'তোমার জেঠাতো ভাইয়েরা মাস্তান টাইপের। গ্রামেই থাকে। প্রভাব প্রতিপত্তি তোমার চেয়ে বেশি। এক ফাঁকে তোমার পৈতৃক ভিটেটাই দখল করে বসবে।' স্ত্রী বলেছিলেন।

'ধুর, কী যে বল না তুমি!'

'মাথা ঠাণ্ডা করে আমার কথাটি ভেবে দেখ তুমি। আমাদের ছেলেটি এখনও বালক। যদি ভিটেটা দখলই করে ফেলে ওরা, করবেটা কী তুমি? কী করতে পারবে?' ধীরে ধীরে বলেছিলেন।

চুপ মেরে গিয়েছিলেন ধরণীবাবু। বউ তো ঠিকই বলছেন। জেঠাতো ভাইয়েরা তিন ভাই। উনি তো একা। তাছাড়া ওরা মাস্তান ধরনের। ওদের সঙ্গে পেরে উঠবেন কেন তিনি? তাহলে এখন কী করা উচিত তাঁর?

বউটি যেন তাঁর মনের কথা বুঝতে পারলেন। বললেন, 'শোন, আমি একটি জায়গা দেখেছি। তিন কাঠার। গোলাপ সিংহ লেইনে। ওপারে চলে যাবে ওরা। বলছে, উচিত দাম পেলে বিক্রি করে দেবে।'

আর দোনামনা করেননি ধরণীবাবু। জন্মভিটেটা বিক্রি করে দিয়ে গোলাপ সিংহ লেইনের জায়গাটি কিনে নিয়েছিলেন। ম্যানেজারের স্বাক্ষর জাল করে মেরে দেওয়া টাকা দিয়ে ওই জায়গায় তেতলাটি তৈরি করেছিলেন। দোতলার পশ্চিমের ফ্ল্যাটে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকেন ধরণীবাবু। অন্য পাঁচটা ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়েছেন। ওই ভাড়ার টাকায় তাঁর সংসার চলে স্বচ্ছন্দে। ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েছেন, বুয়েট থেকে। ঢাকার একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে ভালো বেতনের চাকরিও পেয়ে গেছে সুলাল। গেল বছর জাঁকজমকে বিয়ে করিয়েছেন ছেলেকে। বউ নিয়ে সুলাল ঢাকাতেই থাকে। পুজো-উৎসবে বাপের বাড়িতে এসে দু'চারদিন সপরিবারে থেকে যায় সুলাল।

ব্যাংকের চাকরির পর আর কোনো চাকরি করেননি ধরণীবাবু। হাতে অঢেল টাকা। চাকরির দরকার কী? বছর দুই ঘর তৈরিতে গেল। থিতু হবার পর বউ বলল, 'চাকরির দরকার নেই আর। ভাড়ার টাকা তো কম না। তাছাড়া ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। ও বেরিয়ে এলে টাকা খরচের কোনো পথই থাকবে না আমাদের। এখন থেকে খাবেদাবে আর আমাকে দেখবে।'

'মানে!'

'বুড়ো খোকা, বুঝছ না কী বলছি?' বুকের আঁচলটা আলগা করে সুদেষ্ণা বলেছিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এতক্ষণে বুঝতে পেরেছিলেন বউয়ের কথার মানে। চেয়ার ছেড়ে সুদেষ্ণাকে পেছন থেকে জাপটে ধরেছিলেন।

সুদেষ্ণা গলায় রস ছড়িয়ে বলেছিলেন, 'পেছনে কেন, সামনে জড়াও।'

সেদিন থেকে ধরণী-সুদেষ্ণার দাম্পত্যজীবনের চেহারাটাই পাল্টে গিয়েছিল। জড়াজড়ি, চুমোচুমি, ভালোবাসাবাসি।

পাল্টাবেও না কেন? সুদেষ্ণা তো আর দেখতে মলয়া-স্বপ্না-রত্নার মতো নারী নন। আধুনিক কালের মানুষরা খাসা বা বিন্দাস শব্দ যে জন্য ব্যবহার করে, সুদেষ্ণা ছিলেন সেরকমই। ছিলেন বলছি কেন, এই তিপ্পান্ন বছর বয়সেও তাঁর দিক থেকে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। একবার তাকানোর পর ঘুরে আরেকবার তাকাতে ইচ্ছে করে। পাঁচ ফুট সাড়ে চারের সুদেষ্ণা। কালো নন। আবার ফর্সা বললে উপহাস বোঝাবে। কালো আর গৌরবর্ণের মাঝামাঝি গায়ের রং। কোমর ছাড়ানো চুল। এই তিপ্পান্নতেও একটা চুল পাকেনি। তবে আগে যে রকম ঝাঁকড়া ছিল, এখন সে রকম নেই, একটু পাতলা হয়ে এসেছে এই যা। শরীরের গাঁথুনি ভালো। স্তনযুগল এখনও ঈর্ষণীয়ভাবে পুরুষ্টু, উন্নত। সুদেষ্ণার শরীর নিয়ে ধরণীবাবুর দিন কাটে, রাত কাটে। সুদেষ্ণাও ধরণীবাবুকে উসকান। একে তো খালি ফ্ল্যাট, তার ওপর সুদেষ্ণার লোভনীয় শরীর। রসেবশে কাটতে থাকে ধরণীবাবুর জীবন।

ষাট পেরোনোর পর ধর্মকর্মের দিকে ঝুঁকলেন ধরণীবাবু। পাশের গলির শ্যামকালী মন্দিরে যাতায়াত শুরু করলেন তিনি। মাঝেমধ্যে দু'একটা ধর্মসভায় বক্তৃতাও দিতে শুরু করলেন। বক্তৃতা দিতে গিয়ে বুঝলেন, ধর্মগ্রন্থ আর শাস্ত্রাদি ভালো করে পাঠ না করলে বক্তৃতা ঠিকঠাকমতো জমবে না। তিনি গীতা, রামায়ণ, পুরাণ– এসব পড়া শুরু করলেন। বেশি করে পড়তে লাগলেন 'মহাভারত'। পড়তে পড়তে তাঁর ঘোর লেগে গেল। আরে! মানবজীবনের সব কথাবার্তা তো 'মহাভারতে' সন্নিবেশিত! প্রেম-অপ্রেম-পরকীয়া-উল্লাস-ক্ষরণ-হত্যা-গুপ্তহত্যা সবই তো আছে এই গ্রন্থে! মানুষের বহির্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্গত জীবনের কথা লিখতে ভোলেননি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

ধরণীবাবু 'মহাভারত' পড়েন আর ভাবেন। ভাবেন আর মানুষকে বলেন। এখন শ্যামকালী মন্দিরে, সপ্তাহে অন্তত একটি সন্ধ্যায় কথা বলতে হয় তাঁকে। শুক্রবার সন্ধ্যায় ভক্তরা একত্রিত হয় মন্দির প্রাঙ্গণে। ওইদিন মন্দিরের পুরোহিত শ্রী নিত্যানন্দ ভট্টাচার্যও ধর্মকথা শোনান শ্রোতাদের। কিন্তু তাঁর বক্তৃতা শ্লোক-সমাকীর্ণ, নীরস। পুরোহিতের বক্তৃতা শুনতে শুনতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

উসখুস করতে থাকে শ্রোতারা। বারবার ধরণীবাবুর দিকে তাকায়। কখন ভট্টাচার্য মশাইয়ের বক্তৃতা শেষ হবে, কখন ধরণীবাবু বক্তৃতা দেওয়া শুরু করবেন– এই আশায় থাকে। ধরণীবাবু বক্তৃতা দিতে শুরু করলে হাততালি পড়ে, শেষ হলে আরও জোরে। বক্তৃতায় কী এমন বক্তব্য থাকে যে, মানুষরা তাঁর কথা শুনবার জন্য পাগলপ্রায়? ভাবেন ধরণীবাবু। তিনি ধর্মকে যুক্তিগ্রাহ্য বাস্তবজগতে এনে দাঁড় করান, পুরাণকাহিনীকে মানবকাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে একটা স্বস্তিকর বিশ্বাসের জগৎ তৈরি করে দেন শ্রোতাদের সামনে। শ্রোতারা তখন ভাবতে বসেন—সত্যিই তো, ধর্ম তো কোনো অধরা কল্পলোকের বস্তু নয়, যাকে নিছক পুরাণকাহিনী বলে এতদিন উড়িয়ে দিয়েছে, তা তো এই গার্হস্থ্য জীবনের চৌহদ্দিতে সংঘটিত হয়ে চলেছে অবিরাম!

গত পরশু সন্ধেয় ধরণীপ্রসাদ চক্রবর্তী বক্তৃতা দিলেন পাণ্ডু আর তাঁর দুই স্ত্রীকে নিয়ে। দুই যুবতী স্ত্রী কুন্তী আর মাদ্রীকে নিয়ে পাণ্ডু বনবাসে গেছেন। বনবাসের কারণটি অবশ্য 'মহাভারতে' নেই। অরণ্যচারী মানুষ যে কৃচ্ছ্রসাধন করে, যে রকম শরীর-সংযমী হয়, ওঁরা কিন্তু সেরকম কিছু করেননি। বরং মৃগয়ায় গেলে মানুষ যে রকম আনন্দ ফুর্তি করে, তাঁরা তা-ই করেছেন অরণ্যমধ্যে।

হস্তিনাপুরে দুই স্ত্রীকে নিয়ে আরাম-আয়াসে দিন কাটছিল পাণ্ডুর। বড় ভাই ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ। অন্ধত্বের কারণে বয়োজ্যেষ্ঠ হয়েও রাজ্য চালানোর অধিকার পাননি তিনি। দেশ শাসনের অধিকার পেয়েছিলেন অনুজ পাণ্ডু। রাজা হবার অস্বস্তি তাঁকে পেয়ে বসেছিল। একদিন সব ছেড়েছুড়ে বনে যাওয়া মনস্থ করলেন। রাজ্য শাসনের যে অস্বস্তি, তা থেকে মুক্তি নিয়ে সস্ত্রীক বনে চলে গেলেন পাণ্ডু। অরণ্যবাসের একদিন মৃগয়ায় গেলেন পাণ্ডু। বধ করলেন এক হরিণীকে। হরিণ স্বমূর্তি ধারণ করলেন। কিমিন্দম মুনি হরিণরূপ ধারণ করে বনের হরিণীকে সংগম করছিলেন। মানুষীতে অরুচি ধরে গিয়েছিল বোধ হয় ঋষি কিমিন্দমের। তাই তাঁর হরিণীতে উপগত হওয়া। পাণ্ডু তো আর মুনির বিচিত্র-বিদ্‌ঘুটে স্বভাবের কথা জানেন না। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম মৃগয়া। সেই ধর্মই পালন করেছেন পাণ্ডু। কিন্তু সংগমে ব্যর্থ মুনি পাণ্ডুকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন, 'হে পাণ্ডু, তুমি স্ত্রীতে উপগত হতে পারবে না আর কোনোদিন। তোমার বাসনা জাগবে স্ত্রীসংগমের, কিন্তু ওই ইচ্ছের বশবর্তী হয়ে স্ত্রীসংগমে রত হলে তোমার মৃত্যু হবে। এই আমার অভিশাপ।'

'ক্ষত্রিয়ের ধর্ম মৃগয়া, আপনি যে হরিণরূপ ধারণ করে মানবেতর প্রাণীতে কামের পরিতৃপ্তি ঘটাচ্ছেন, তা তো আমার জানার কথা নয়। আপনি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আপনার অভিশাপ ফিরিয়ে নিন মুনিবর।' এরকম নানা যুক্তি দেখিয়ে ক্ষমা চাইলেন পাণ্ডু কিমিন্দম মুনির কাছে। কিন্তু মুনির এক কথা– আজ থেকে তুমি অভিশপ্ত পাণ্ডু। কোনো নারীতে উপগত হয়েছ তো মরেছ।

অরণ্যগৃহে ফিরে প্রিয়তমা স্ত্রী কুন্তীকেই শুধু অভিশাপের কথাটা বললেন। কুন্তী নিজে সাবধান হলেন, মাদ্রীকেও সাবধান করলেন। পাণ্ডু স্ত্রীকে পাশে নিয়ে আদর করেন, উপগত হবার প্রস্তুতিপর্ব সমাপন করেন। কিন্তু স্ত্রীসংগমের চরম তৃপ্তি লাভ করতে পারেন না। কিমিন্দমের অভিশাপের কথা তাঁর মনে পড়ে যায়। ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যান তিনি। সংগমেচ্ছা নিমিষেই উধাও হয়ে যায় তাঁর মন থেকে। শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ে। বিব্রতাপন্ন মন নিয়ে পাশ ফিরে শোন পাণ্ডু। স্ত্রীরা অস্বস্তিময় শরীর নিয়ে শয্যা থেকে উঠে যান।

সেদিন শ্যামাকালী মন্দিরের বক্তৃতা শেষে বাড়ি ফিরে 'মহাভারত' নিয়ে বসেন ধরণীবাবু। পুনরায় পড়তে থাকেন পাণ্ডু-কুন্তী-মাদ্রীর অংশটি। এই কাহিনী পড়তে পড়তে নিজের মধ্যে একধরনের অস্বস্তি অনুভব করতে থাকেন ধরণীপ্রসাদ চক্রবর্তী। গত মাস ছয়েক ধরে তিনিও যেন পাণ্ডুর মতন হয়ে গেছেন। তবে পাণ্ডু আর তাঁর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। পাণ্ডুর মধ্যে উত্তেজনা আছে, কিন্তু স্ত্রীসংগমে অভিশপ্ত। ধরণীবাবুকে কেউ অভিশাপ দেয়নি, তারপরও ইদানীং তিনি সুদেষ্ণাসংগমে ব্যর্থ। সুদেষ্ণা পাশে শুয়ে থাকেন, শরীরের কাপড়চোপড় আলুথালু করে রাখেন। যে স্তনযুগলে তিনি বিয়ে-পরবর্তী দিন থেকে আসক্ত, সেই পুরুষ্টু স্তন দুটো এখন আর তাঁকে আকুল করে না। তাঁর সকল শারীরিক উত্তেজনা মরে গেছে যেন। আগে সময়ে অসময়ে সুদেষ্ণার শরীর নিয়ে খেলা করতেন ধরণীপ্রসাদ, এখন মোটেই ইচ্ছে করে না এসব করতে। ভেতরের সকল কাম সমাধিপ্রাপ্ত হয়ে গেছে যেন।

একদিন লজ্জা ত্যাগ করে সুদেষ্ণা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে তোমার? আমার দিকে তাকাও না যে, আগের মতো।'

'পারি না।' সংক্ষিপ্ত উত্তর ধরণীবাবুর।

'মানে!' অবাক চোখে মৃদু কণ্ঠে বলেন সুদেষ্ণা।

'এখনও তোমাকে আগের মতো পেতে ভীষণ ইচ্ছে করে আমার। কিন্তু নেওয়ার যে শক্তি তা আমার ফুরিয়ে গেছে। আমি পাণ্ডুর মতো অভিশপ্ত নই, কিন্তু কী এক অলক্ষিত দৈব-অভিশাপে আমার সবকিছু শেষ হয়ে গেছেরে সুদেষ্ণা।' বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন ধরণীপ্রসাদ চক্রবর্তী।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সহোদর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'কী পেলে যুধিষ্ঠির?'

'বুঝতে পারলাম না মা।'

'যুদ্ধশেষে কী পেলে তুমি?'

'জয় পেয়েছি মা। অন্যায়কে নির্মূল করতে পেরেছি।'

'এই জয়ে কি সুখ আছে? আনন্দিত হয়েছ?'

'কোন জয়ে আনন্দোল্লাস থাকে না মা?'

'যে জয়ে আত্মীয়ের রক্ত মিশে থাকে না। তোমাদের এই জয়ে আত্মীয়-পরমাত্মীয়ের রক্ত লেগে আছে।'

'দুর্যোধনদের যদি জয় হতো, সেই জয় আমাদের মৃতদেহের বিনিময়ে হতো।'

'তাদের বিজয় এত অগণন নিকটজনের রক্তে স্নাত হতো না।'

'তারা দুরাচারী মা। অন্যায়কারী তারা। হেন দুষ্কর্ম নেই, যা দুর্যোধন-দুঃশাসনরা করেনি।'

'কারা বেশি দুষ্কৃতকারী? তোমরা না কুরুরা?'

'ওরা মা, ওরাই দুষ্কৃতকারী।'

'মিথ্যে। মিথ্যেবাদী তুমি যুধিষ্ঠির। আর তোমার নিকটে ওই যে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছে উদাসীন ভঙ্গিতে, ও হল সকল দুষ্কর্মের প্রণোদনাকারী।'

'তুমি ঠিক বলছ না মা। কৃষ্ণ আমাদের সুহৃদ, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কৃষ্ণ, আমি, আমার চারভাই মিলে অন্যায়কে ঝেঁটিয়ে ভারতবর্ষ থেকে দূর করেছি।'

'অর্জুনের কথা বলতে চাইছ তুমি নিশ্চয়। ওকে তো ভুবনখ্যাত ধনুর্ধর বল তোমরা, তাই না?'

'এটা আজ জগতস্বীকৃত সত্য মা।'

'সেই জগতস্বীকৃত অর্জুন কী করেছে? দ্রোণাচার্যকে হত্যা করিয়েছে।' তারপর অর্জুনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে কুন্তী বললেন, "শিক্ষাগুরু তো পিতার সমান, তা-ই না অর্জুন? সেই পিতৃসম দ্রোণাচার্যকে মিথ্যে সংবাদে হতমান করেছ, বাণে বাণে জর্জরিত করেছ। হতমান, নিরস্ত্র গুরুর মুণ্ডচ্ছেদের জন্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে লেলিয়ে দিয়েছ। দাওনি অর্জুন? মাথা নিচু করছ কেন? ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে 'অশ্বত্থামা হত, ইতি গজঃ' বলাওনি?"

'উনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মা। আমরা নিরুপায় ছিলাম। তাঁকে নিধন করার পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'তাই বলে ছলনায় হত্যা করা! যে আচার্যের পায়ের কাছে বসে অস্ত্রবিদ্যা শিখলে, তার মাথা কেটে নিলে? ছিঃ। কোন সুনীতির বলে এই দুষ্কর্ম করলে তোমরা? আর কর্ণ! কর্ণকে কী নির্মমভাবে হত্যা করলে তোমরা, যুধিষ্ঠির! অর্জুন, কী করলে তুমি! কৃষ্ণের প্ররোচনায় মহাবীর কর্ণকে কী বীভৎসভাবে হত্যা করলে অর্জুন! ও মা গো....।' হুড়মুড় করে মাটিতে ভেঙে পড়লেন কুন্তী। তাঁর দু'চোখ থেকে অবিরত অশ্রু গড়াতে লাগল।

আঠারো দিনে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়েছে। আঠারো অক্ষৌহিণী যোদ্ধার রক্তে কুরুক্ষেত্রের প্রতি ইঞ্চি ভূমি ভিজে গেছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন, দুর্যোধনের নিরানব্বই জন ভাই, কুরুপক্ষের সব রথী, মহারথীরা যুদ্ধভূমিতে শয্যাগ্রহণ করেছেন। পাণ্ডবপক্ষেও কি হতাহতের সংখ্যা কম? যুধিষ্ঠিরদের শ্বশুর দ্রুপদ, শ্যালক ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমপুত্র ঘটোৎকচ, পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চপুত্র, কতজনের নাম করা যায়, সবাই নিহত হয়েছেন জীবননাশী এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। পাণ্ডবদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়ে গেছে অভিমন্যুর নিধনে। হস্তিনাপুরে বা হস্তিনাপুরের বাইরের দেশের এমন কেউ নেই, যার একজনও আত্মীয়স্বজন মারা যায়নি।

একই কুরুরাজপ্রাসাদের সন্তান এই কৌরব আর পাণ্ডবরা। ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু দুই ভাই। ধৃতরাষ্ট্র বড় আর পাণ্ডু ছোট। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। তারপরও অনুজ পাণ্ডুর সিংহাসন-উদাসীনতার কারণে হস্তিনাপুরের ভারপ্রাপ্ত রাজা হয়েছেন তিনি। কুন্তী ও মাদ্রী নামের দুই স্ত্রীকে নিয়ে নগরে-অরণ্যে আনন্দের দিনরাত্রি পার করছেন পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্রের ঘরে শতপুত্রের জন্ম হয়েছে, দৈবচক্রে পাঁচপুত্রের পিতা হয়েছেন পাণ্ডু। কালক্রমে অভিশপ্ত পাণ্ডু স্ত্রীসংসর্গ করতে গিয়ে মারা গেছেন। মাদ্রী তাঁর সঙ্গে জীবন্ত চিতায় উঠেছেন। নকুল ও সহদেব নামের দুই সতীনপুত্রকে মাতৃবাৎসল্যে লালন করলেন কুন্তী। পঞ্চপাণ্ডব আর শতভ্রাতা আচার্য দ্রোণের পাঠশালায় অস্ত্রবিদ্যার পাঠ নিল। এইটুকু পর্যন্ত জীবন চলল সহজ সরল পথে।

পরিস্থিতি সংকটাপন্ন হল, যখন জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের যুবরাজ হিসেবে বরিত হবার সময়কাল উপস্থিত হল। যুবরাজই দেশের পরবর্তীকালের নৃপতি। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র; সহোদরদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। ধৃতরাষ্ট্রের অব্যবহিত পরে যুবরাজ হবার অধিকার তারই। এরকমই দাবি তাঁর, সমর্থনও তাঁর পক্ষের রাজন্যদের। যুধিষ্ঠির কুরু-পাণ্ডব– সব ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। হস্তিনাপুরের রাজ্যনীতিতে বড় ভাইয়ের রাজা হবার অধিকার। যেমন হয়েছেন ধৃতরাষ্ট্র। প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডুর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অনাগ্রহের কারণে রাজ্যশাসক তিনিই হয়েছেন। এদেশের সিংহাসনে যুধিষ্ঠিরের অধিকার সর্বাগ্রে গণ্য। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের দরবারে যুধিষ্ঠিরদের দাবি অগ্রাহ্য হল। নামকাওয়াস্তে রাজ্য ভাগ করে দিলেন ধৃতরাষ্ট্র। বললেন– হস্তিনাপুরের সিংহাসনে তোমাদের পাঁচ ভাইয়ের অধিকার নেই। সেই অধিকার দুর্যোধনের। তবে তোমাদের বঞ্চিত করব না আমি। এই বলে রাজ্যের নিষ্ফলা যে ভূমি, সেই ইন্দ্রপ্রস্থের অধিকার দিলেন পাণ্ডুপুত্রদের। পাণ্ডবরা সেখানে গিয়ে রাজ্যপাট গুছিয়ে নিল। অভাবিত ঐশ্বর্যে নতুন রাজধানীকে সজ্জিত করল। রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের জৌলুস হস্তিনাপুরকে হার মানাল। ক্রোধে আর হিংসায় জ্বলে উঠল দুর্যোধন। হস্তিনাপুরের প্রাচীন বৈভবকে ম্লান করবে ইন্দ্রপ্রস্থ? কখনোই নয়। সকল ক্রোধ গিয়ে পড়ল পঞ্চপাণ্ডবের ওপর। শত্রুকে নির্মূল করতে হবে। জতুগৃহে আগুন জ্বলল। কুন্তী আর তাঁর পাঁচপুত্র কৌশলে পালালেন।

এরপর শুধু হিংসা আর ধ্বংসের কূটজাল বিস্তৃত হয়েছে হস্তিনাপুর থেকে দ্রুপদরাজ্য পর্যন্ত। এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন কৃষ্ণ থেকে ভীষ্ম, দ্রুপদ থেকে দ্রোণাচার্য পর্যন্ত। পাঁচ ভাই মিলে দ্রৌপদীকে বিয়ে করেছে। দ্রৌপদী কুরুবংশের ধ্বংসের প্রতীক হয়ে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করেছে। সূতপুত্র কর্ণ এসে যুক্ত হয়েছে দুর্যোধনশিবিরে। নৃপতি হয়েও ধৃতরাষ্ট্র নিষ্ক্রিয়, সকল ক্ষমতার আধার হয়েছে দুর্যোধন। রাজসভার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দুর্যোধনের কুক্ষিগত হয়েছে। দরবারে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, বিদুর নির্বাক। ধৃতরাষ্ট্র স্নেহান্ধ। দৈহিক আর মানসিক অন্ধত্ব ধৃতরাষ্ট্রকে একেবারে নির্বীর্য করে ছেড়েছে। কর্ণ দুর্যোধনের নিয়ন্ত্রণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। শকুনির কুপরামর্শ দুর্যোধনকে অধিকতর লোভী ও হিংস্র করে তুলেছে।

পাশাখেলার নামে জুয়াখেলার আসর বসেছে। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে সেই পাশাক্রীড়ায় আহ্বান জানানো হয়েছে। যুধিষ্ঠির জুয়াসক্ত। শকুনির চালে একে একে রাজ্যপাট, হাতি, ঘোড়া, ধন-ঐশ্বর্য, দাসদাসী, ভীম-অর্জুন-নকুল-সহদেব সবকিছুকে, সবাইকে হারাল। শেষ পর্যন্ত বাজি ধরল দ্রৌপদীকে। এই বাজিতেও হারল যুধিষ্ঠির। দ্রৌপদীকে রাজসভায় এনে হেনস্তা করল দুর্যোধন-দুঃশাসন। তারপর এল বারো বছরের বনবাস আর একবছর অজ্ঞাতবাসের বাজির পালা। শকুনি দুর্যোধনের হয়ে ঘুঁটির কূটচালে তাও জিতে নিল।

তেরো বছর পার করে যুধিষ্ঠিররা পুনরায় রাজ্যধিকার চাইলে দুর্যোধনের সাফ উত্তর, 'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।' কৌরব এবং পাণ্ডব– এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুই শিবিরে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পড়ল। অধিকাংশ রাজা যোগ দিল কৌরবপক্ষে। সামান্য সংখ্যক রাজানুগ্রহ নিয়ে পাণ্ডবরা যুদ্ধপ্রস্তুতি সম্পন্ন করল। কৌরবপক্ষের এগারো অক্ষৌহিণী আর পাণ্ডবপক্ষের সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

যুদ্ধ হল, মৃত্যু হল। কৌরবপক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। পাণ্ডবপক্ষে বেঁচে থাকল মুষ্টিমেয় কিছু সৈন্য এবং পঞ্চপাণ্ডব। আর বেঁচে থাকলেন কৃষ্ণ। আর বেঁচে থাকল লক্ষ লক্ষ বিধবা নারী। তাদের সব হারানোর আর্তনাদে পৃথিবী প্রকম্পিত হতে থাকল।

অগ্রহায়ণের ঘোর অমাবস্যার রাতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হল। জয়ের আনন্দ নিয়ে যুধিষ্ঠিরাদি ভাইয়েরা মা কুন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। সঙ্গে ভার্যা দ্রৌপদী। সামনে সন্তানদের দেখে কুন্তী জিজ্ঞেস করেছিলেন, যুদ্ধশেষে কী পেলে যুধিষ্ঠির?

মায়ের কথা শুনে যুধিষ্ঠির বেশটুকু অবাকই হয়েছিল। একী প্রশ্ন মায়ের! মা কী বলতে চাইছে, অনুধাবন করতে পারছে না যুধিষ্ঠির। কুরুক্ষেত্রের এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য কে বা কারা দায়ী, সেটা কি মা জানে না? দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় মা-ই তো অঝোর ধারায় কেঁদে বুক ভাসিয়েছিল। বারোটি বছর এই জননীই তো তাদের সঙ্গে বনে-অরণ্যে ঘুরে ঘুরে অনাহারে অর্ধাহারে দিন আর রাত কাটিয়েছে। কত শতবার বনের হিংস্র শ্বাপদ যে তাদেরকে আক্রমণে উদ্যত হয়েছে, সেই স্মৃতি কি মা বিস্মৃত হয়ে গেছে? বনবাস শেষে শুধু মাথা গুঁজবার জন্য কৃষ্ণ তাদের হয়ে মাত্র ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পাঁচখানি গ্রাম চেয়েছিলেন। 'বিনাযুদ্ধে নাহি দেব সূচ্যগ্র মেদিনী'- দুর্যোধনের এই দম্ভোক্তির কথা মার তো এত সহজে ভোলার কথা নয়। তাহলে, তাহলে মায়ের কষ্টটা কোথায়? কোথায় আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ে তাদের বুকের কাছে টেনে নেবে, তা না, কঠিন চোখে জিজ্ঞেস করে বসল– কী পেলে যুধিষ্ঠির? যুদ্ধ তোমাদের কী এনে দিল?

মায়ের এই অভিব্যক্তির কারণ কী? কেনই বা দোষারোপ করছে কৃষ্ণকে, অর্জুনকে? এরা তো যুদ্ধের নিয়ম মেনেই যুদ্ধ করেছে। নিয়ম মানে অনিয়ম। অনিয়মই তো যুদ্ধের নিয়ম। হ্যাঁ, সে নিজে বিরাট একটা অন্যায় করেছে বটে, পুত্র অশ্বত্থামা নিধনের মিথ্যে সংবাদ দিয়ে গুরু দ্রোণাচার্যকে নিরস্ত্র করেছে। ওই সময় বাণে বাণে ঘনঘোর বাতাবরণের সৃষ্টি করেছে অর্জুন। ফলে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহজেই আচার্যের মাথা কেটে নিয়েছে। এই জন্য সে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিবেকদংশনে দংশিত হচ্ছে অবিরত। কুরুরাজসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা তার অন্য চার ভাইয়ের মতো তাঁকেও হিংস্র করে তুলেছে। সবকিছু সহ্য করা যায়, দ্রৌপদীর অপমানকে সহ্য করে কী করে? এই জন্যই তো দুঃশাসনের রক্ত পান করেছে ভীম, গদাঘাতে দুর্যোধনের উরু ভেঙেছে।

মায়ের করুণ কণ্ঠ যুধিষ্ঠিরের কানে এল। কুন্তী বলছেন, 'এই প্রাণঘাতী যুদ্ধ কি এড়ানো যেত না যুধিষ্ঠির?'

'কী করে এড়াব মা? সবকিছু মেনে নেওয়া যায়, দ্রৌপদীর অপমান-লাঞ্ছনাকে কি এড়ানো যায়? নারীর অপমান!'

ব্যঙ্গ গলায় হেসে উঠলেন কুন্তী। বললেন, 'তুমি নারীর লাঞ্ছনার কথা বলছ যুধিষ্ঠির? তোমার কাছে নারীর মূল্যায়ন কতটুকু? ভীষ্মের সঙ্গে তোমার কথোপকথনের কথা কি তুমি ভুলে গেলে?'

বিব্রত কণ্ঠে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করল, 'কোন কথোপকথনের কথা বলছ তুমি মা?'

'পিতামহ ভীষ্ম সারাজীবন বিয়ে করলেন না। গঙ্গা তাঁকে জন্ম দিয়েই অন্তর্ধান হয়েছিলেন। মা হিসেবে বা স্ত্রী হিসেবে কোনো নারীকে কাছে পাননি তিনি। তাছাড়া সত্যবতীর পিতা দাশরাজার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায় নারী-সংসর্গ থেকে নিজেকে সর্বতোভাবে বিরত রাখলেন তিনি। সেই ভীষ্মের কাছে নারীচরিত্রের ব্যাখ্যান চাইলে তুমি। কী বলে চাইলে?' কথা থামিয়ে পুত্রের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে থাকলেন কুন্তী।

বিব্রত চোখে মাথা নিচু করল যুধিষ্ঠির। অন্যান্য ভাইয়েরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করল। দ্রৌপদী তীক্ষ্ণ চোখে শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল। প্রশ্নসংকুল চোখে কৃষ্ণ তাকিয়ে থাকলেন কুন্তীর দিকে। দূরে দাঁড়ানো অমাত্যরা উৎকর্ণ হয়ে থাকল।

যুধিষ্ঠির ম্লান মুখে মায়ের দিকে একবার তাকাল। কুন্তী বললেন, 'তুমি পিতামহ ভীষ্মকে বলেছিলে– নারীরা সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য হিসেবে প্রতিপন্ন করে থাকে। নারীরা কোন পুরুষের প্রতি অনুরক্ত আর কোন পুরুষের প্রতি বিরক্ত, তা বোঝার উপায় নেই। কীভাবে কামিনীদেরকে পরপুরুষ-সংসর্গ থেকে নিবৃত্ত করা যায় বলুন পিতামহ, এই তো জিজ্ঞেস করেছিলে তুমি?'

যুধিষ্ঠির নিরুত্তর। ভাবছে– মা কী করে জানল এসব কথা। কুন্তী যেন তার মনের কথা বুঝতে পারলেন। বললেন, 'দেখ যুধিষ্ঠির, রাজমাতা আমি। আমারও কিছু সংবাদ-সরবরাহকারী আছে। তোমাকে জিজ্ঞেস করি যুধিষ্ঠির,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক'জন মহিলার সংসর্গে এসেছ তুমি? ক'জন মহিলা তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? তুমি কি দ্রৌপদীর নিরিখে একথা বলেছিলে? দ্রৌপদী কি সেরকম? আর উত্তরে পিতামহ ভীষ্ম কী বলেছিলেন, তা তো তোমার নিশ্চয় মনে আছে?'

দ্রৌপদীর দিকে ম্রিয়মাণ চোখে একবার তাকাল যুধিষ্ঠির। তারপর অসহায় গলায় মাকে বলল, 'থাক না মা সেসব কথা।'

চড়া গলায় কুন্তী বললেন, 'থাকবে কেন? আজকে তো চুপ করে থাকার দিন নয়। আজকে তোমাদের প্রাপ্তির দিন, আমার বলার দিন, আর হাহাকারের দিন।'

একটু থেমে আবার বললেন কুন্তী, 'নারী সংসর্গরহিত ভীষ্মদেব সেদিন অতি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন নারীজাতি সম্পর্কে। মনে পড়ে তোমার?' তারপর ঊর্ধ্বাকাশের দিকে তাকালেন কুন্তী। চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। হয়তো পিতামহ ভীষ্মের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন অথবা যুধিষ্ঠিরকে কী বলবেন, তা মনে মনে গুছিয়ে নিলেন। যুধিষ্ঠিরের চোখে চোখ রেখে বললেন, তাঁর কণ্ঠে গভীর শ্লেষের আভাস, 'মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্ম বলেছিলেন– নারীচরিত্রের তুলনা চলে শুধু প্রজ্বলিত অগ্নির সঙ্গে, ময়দানবের মায়ার সঙ্গে, ক্ষুরধার সর্পের সঙ্গে। প্রজাপতি স্ত্রীজাতিকে যখন সৃষ্টি করেছেন, সেই থেকে তারা ব্যভিচারী। সুখৈশ্বর্য দিয়েও তাদের সংযত করা যায় না। কূটবাক্য প্রয়োগ, প্রহার, বন্ধন অথবা নানারকম ক্লেশ দিয়েও নারীদের পরকীয়া থেকে বিরত করা যায় না। এই তো বলেছিলেন, পিতামহ ভীষ্ম! তা-ই না যুধিষ্ঠির?'

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন কুন্তী। বললেন, 'এইতো তুমি, এই-ই তো তোমরা। এই যুধিষ্ঠিরই তো বউকে বাজি ধরতে পারে জুয়াখেলায়। বউকে পণ্যই তো ভাব তুমি। সেই তুমি দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মূল কারণ বলছ। কতটুকু মূল্য দাও তুমি নারীদের? যাদের মূল্য দাও না মোটেই, তাদের দোহাই দিয়ে বিধ্বংসী যুদ্ধের আয়োজন করলে।' অনেকক্ষণ কথা বলে হাঁপিয়ে উঠলেন কুন্তী।

কৃষ্ণ বিব্রত বোধ করতে থাকলেন। কুন্তীকে শান্ত করার জন্য দ্রুত বললেন, 'এই যুদ্ধ অনিবার্য ছিল রাজমাতা।'

'অনিবার্য! অনিবার্য ছিল এই যুদ্ধ!!' তীব্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন কুন্তী। তারপর কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে হিংস্র গলায় বললেন, 'তোমার মতো কূটচারী কৃষ্ণ যাদের সঙ্গী, তাদের কাছে তো এই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবেই।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'আপনি আমাকে শুধু শুধু দোষারোপ করছেন রাজমাতা। আমি তো আপনার পুত্রদের ন্যায় আর নীতির পথে চলবার পরামর্শ দিয়েছি মাত্র।' কৃষ্ণ বললেন।

কুন্তী শক্ত গলায় বললেন, 'যে নিজে ন্যায়ের পথে চলে না, সে কী করে সুনীতির পথে চলবার পরামর্শ দেয়? গোটাটা জীবন তো অন্যায়ই করে গেছ তুমি কৃষ্ণ।'

বিভ্রান্ত চোখে কৃষ্ণ কুন্তীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। অন্যদিন হলে রূঢ় কণ্ঠে কুন্তীর প্রশ্নের জবাব ফিরিয়ে দিতেন। কিন্তু আজ যে মহান দিন, আজ বিজয়ের দিন। এক মহারক্তসমুদ্র সাঁতরে আজ পাণ্ডবরা বিজয়ের কূলে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ এই স্বস্তির দিনে কঠোর কথায় কুন্তীকে আঘাত দিতে চান না তিনি। কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না, কেন হঠাৎ রাজমাতা উগ্ররূপ ধারণ করলেন। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তো তাঁকে জানানো হয়েছে, সেই সময়ে তো প্রীতিভাবই দেখা গেছে তাঁর চোখেমুখে। কিন্তু সেদিনের রাজমাতার সঙ্গে তো আজকের রাজমাতার মিল নেই। যুদ্ধের ভয়ংকরতার জন্য, যুদ্ধের শেষের দিকের সংবাদ অবশ্য তাঁকে দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দ্রোণের নির্দেশে দিন ও রাত্রিব্যাপী যুদ্ধ চলেছে সেসময়। শেষের দিকে এমন কী ঘটনা ঘটল, যার জন্য রাজমাতার মনোবৃত্তিই বদলে গেল! যুদ্ধজয় তো তাঁকে ভীষণভাবে আনন্দিত করার কথা। কিন্তু.....।

ভাবনা শেষ করতে পারলেন না কৃষ্ণ। কুন্তীর কথা কানে এল, 'তুমি বলছ, আমার সন্তানদের তুমি সৎপথে পরিচালিত করেছ, তাই কি কৃষ্ণ? অর্জুনকে দিয়ে তুমি খাণ্ডবদাহন করালে, হাজার হাজার পশুপাখি হত্যা করালে তুমি অর্জুনকে দিয়ে, এটা কি যথার্থ করেছ তুমি? এত বড় রাজা জরাসন্ধ, তিন অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধীশ্বর, তাকে ব্রহ্মচর্য পালন অবস্থায় হত্যা করালে ভীমার্জুনকে দিয়ে। উপবাসে ক্লিষ্ট, অসহায় জরাসন্ধ কী নিদারুণভাবেই না নিহত হল! এটা কি তোমার সৎপথে পরিচালনার উদাহরণ?'

কৃষ্ণ নিম্নস্বরে বললেন, 'জরাসন্ধ দুরাত্মা ছিল, হত্যাই তার প্রাপ্য।'

'ছলনায় হত্যা করিয়েছ তাকে। বীরের মতো যুদ্ধ করার সুযোগ দাওনি জরাসন্ধকে।' কুন্তী বললেন।

'ও বড় শক্তিশালী ছিল, ওভাবে তাকে হত্যা না করলে....।'

কৃষ্ণের কথা শেষ করতে দিলেন না কুন্তী। বললেন, 'ছলনায় হত্যা না করালে জরাসন্ধ অপরাজেয় থাকত, এই তো? আমার দুই পুত্রকে দিয়ে এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মহাবীরকে কূটচালে হত্যা করিয়ে ভীমার্জুনকেই কলঙ্কিত করেছ তুমি। মূলত জরাসন্ধ আর শিশুপাল তোমার প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছিল। তোমার মতো কৃষ্ণের পক্ষে সম্ভব ছিল না তাদের প্রতিরোধ করা। তাই আমার পুত্রদের দিয়ে জরাসন্ধকে নিধন করিয়েছ আর শিশুপালকে হত্যা করেছ তুমি নিজে। দুটো হত্যাই অন্যায় পথে হয়েছে।'

'ওই সময় যদি ওদেরকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে না দিতাম, তাহলে মাত্র আঠারো দিনে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধজয় সম্ভব হতো না। ভীম-অর্জুন-যুধিষ্ঠিরের পক্ষে ওদের সামনে দাঁড়ানো কঠিন হতো।' বললেন কৃষ্ণ।

'কাপুরুষের মতো ওদের সরিয়েছ এই পৃথিবী থেকে। বিচক্ষণ কৃষ্ণের নামের সঙ্গে সঙ্গে কাপুরুষ কৃষ্ণের নামও স্মরণ করবে ভবিষ্যতের পৃথিবী।'

'আপনি আমায় অভিশাপ দিচ্ছেন রাজমাতা?'

'অভিশপ্ত হবারই যোগ্য তুমি।' বলে কুন্তী মৌন হলেন।

অর্জুনের ভেতরটা কেঁপে উঠল। কৃষ্ণ পাণ্ডবকুলের সুহৃদ। তিনি বিচক্ষণ। বিপুল পরাক্রান্ত সৈন্যবাহিনীর চেয়ে একজন বিচক্ষণ পরামর্শক যে আরও দুর্দান্ত, আরও বেশি পরাক্রমশালী, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণ তা প্রমাণ করেছেন। কৃষ্ণ না হলে মাত্র সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে এগারো অক্ষৌহিণী সৈন্যকে পরাজিত করা সম্ভব ছিল না কিছুতেই। কত বড় বড় মহারথী ছিলেন দুর্যোধনদের পক্ষে! ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, একলব্য, এঁরা। কৃষ্ণেরই কূটচালে বড় বড় যোদ্ধাদের মাথা মাটিতে নামাতে পেরেছে সে। এই কৃষ্ণই তো তাকে দু'দুবার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। একবার সুদর্শনচক্র ধারণ করে। আরবার রথচক্রকে মাটিতে দাবিয়ে দিয়ে। নইলে দ্রোণের আর কর্ণের মারণাস্ত্র তার বক্ষকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিত। আজ সেই কৃষ্ণকে দোষারোপ করছে মা! অভিশাপ দিতে চাইছে! যে কোনো মূল্যে মাকে থামাতে হবে।

অর্জুন মাকে উদ্দেশ্যে করে বলল, 'মা তুমি সংযত হও। মিত্র কৃষ্ণকে অভিশাপ দিও না। কৃষ্ণ না হলে এই কুরুক্ষেত্র আমাদেরই রক্তে প্লাবিত হতো। পঞ্চপাণ্ডবের রক্তে ভিজে যেত এই ময়দানের মাটি।'

'চুপ থাক তুমি অর্জুন, চুপ থাক। আমার ভেতরটাকে আর ওলটপালট করে দিও না।' বলতে বলতে আবার ডুকরে উঠলেন কুন্তী। অনেকক্ষণ কাঁদলেন তিনি। তারপর নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করলেন। মৃদুকণ্ঠে বলতে থাকলেন, 'তুমি কৃষ্ণের দোসর অর্জুন। কৃষ্ণের মতো দুরাচারী তুমিও। কৃষ্ণের মতো বহুগামী তুমি। কৃষ্ণের কয়টি বউ জান? আর তোমার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কয়টি? এক দ্রৌপদীতে তুমি তৃপ্ত থাকনি। যেখানেই গেছ, নারীর প্রতি লুব্ধ হয়ে উঠেছ তুমি। সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা, উত্তরা আর কতজনের নাম বলব?' তারপর হঠাৎ নিজেকে সংযত করলেন কুন্তী। আবেগের বশে ছেলেকে যা বলার নয়, তা বলে ফেলেছেন। আসলে যা তিনি অর্জুনকে বলতে চেয়েছেন, তা বলা হয়নি। তা-ই বলতে হবে তাকে। কুন্তী এবার করুণ কণ্ঠে হাহাকার করে উঠলেন, 'তুমি কর্ণকে হত্যা করেছ অর্জুন!'

অর্জুন চমকে মায়ের দিকে তাকাল। বলল, 'ও তো আমার প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল। আচার্য দ্রোণ তাকে তেমন করে অস্ত্রবিদ্যা দান না করলেও পরশুরামের কল্যাণে কর্ণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধনুর্ধরে পরিণত হয়েছিল। দুর্যোধনের মিত্র ছিল সে। পাণ্ডবদের মৃত্যুই ছিল তার একমাত্র কাম্য।'

'মিথ্যে, মিথ্যে অর্জুন। পাণ্ডবদের মৃত্যু তার কাম্য ছিল না। তা যদি হতো যুদ্ধের প্রথম দিকেই তোমাদের সকলের মৃত্যু হতো তার হাতে।'

মায়ের কথা শুনে পঞ্চপাণ্ডব চমকে উঠল ভীষণ। মা এ কী বলছে!

কুন্তী আবার বলতে শুরু করলেন, 'সেই মহাবীর কর্ণকে তুমি অর্জুন, ওই দুরাচারী কৃষ্ণের প্ররোচনায় অসহায় অবস্থায় হত্যা করলে! তুমি তো নাকি ভুবনখ্যাত বীর, বীর হয়ে তুমি কী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলে কর্ণকে!'

'কর্ণ আমাদের শত্রু ছিল মা। মহাবীর ছিল সে। ওভাবে নিধন না করলে, তাকে হত্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। তাই...।'

'তাই কাপুরুষের মতো নিধন করলে তাকে। কাদাময় নরম মাটিতে রথচক্র দেবে গিয়েছিল তার। কুচক্রী সারথি শল্য ইচ্ছে করে নরম মাটির পথে রথ চালিয়েছিল। শল্য কর্ণের সারথি হলে কী হবে, প্রকৃতপক্ষে ও তো ছিল যুধিষ্ঠিরের পোষ্য। সে একজন মস্তবড় বিশ্বাসঘাতক।' তার পর নিবিড় একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন কুন্তী। বললেন, 'রথের চাকা মাটি থেকে তুলতে রথ থেকে নেমেছিল কর্ণ। তখন নিরস্ত্র ছিল সে। ওই সময় খড়্গাঘাতে মাথা নামালে তার। ও মা গো....।' বলতে বলতে দুহাতে মুখ ঢাকলেন কুন্তী।

কৃষ্ণ বললেন, 'ওটাই যুদ্ধনীতি। বেকায়দায় শত্রুকে নিধন করা।'

কুন্তী কান্নাজড়িত গলায় বললেন, 'ভেবে দেখ কৃষ্ণ, নিহত হবার আগে অর্জুনকেও একই রকম বেকায়দায় পেয়েছিল কর্ণ। মনে পড়ে কি তোমার, জলকাদার ভূমিতে তোমাদের রথও দেবে গিয়েছিল? তোমার তো মনে না পড়ার কথা নয়। গোটা যুদ্ধে তুমিই তো অর্জুনের রথ চালিয়েছ। তখন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তোমাদের সামনে সশস্ত্র কর্ণ রথ থামিয়েছিল। তুমি আর অর্জুন, তোমরা দুজনে তখন মাটি থেকে রথের চাকা তুলতে মগ্ন ছিলে। ওই সময় কর্ণ চাইলে একটি মাত্র অস্ত্রের আঘাতে তোমাদের দুজনকে যমালয়ে পাঠাতে পারত। পাঠায়নি। কারণ সে মহাবীর, সিংহ সে। আর তোমরা ছিলে শৃগাল। যে অবস্থায় তোমাদের অস্ত্রাঘাত করেনি কর্ণ, সেই একই অবস্থায় কৃষ্ণের প্ররোচনায় কর্ণকে হত্যা করলে তুমি অর্জুন।' অর্জুনের চোখে চোখ রেখে কথা শেষ করলেন কুন্তী। কুন্তী অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

দ্রৌপদী ধীর পায়ে কুন্তীর দিকে এগিয়ে এল। বলল, 'মা আপনি সংযত হোন। কত যোদ্ধা মারা গেছে এই যুদ্ধে। শুধু তো কর্ণ নন, কর্ণের মতো আরও কত রথী মহারথী নিহত হয়েছেন। অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু, আমার পিতা দ্রুপদ, ভাই ধৃষ্টদ্যুম্ন– সবাই নিহত হয়েছেন।' বলতে বলতে কণ্ঠ বুজে এল দ্রৌপদীর। তারপর নিজেকে সংযত করে দ্রৌপদী আবার বলল, 'আমার প্রিয়তম পাঁচ পুত্র, অশ্বত্থামারা তাদের হত্যা করেছে.....।' বলতে বলতে কুন্তীর পায়ের কাছে ভেঙে পড়ল দ্রৌপদী।

এবার যুধিষ্ঠির আস্তে আস্তে বলল, 'মা তুমি এদের জন্য শোক না করে বার বার কর্ণের জন্য শোকাকুল হচ্ছ।'

হাউমাউ করে উঠলেন কুন্তী। দুহাতে বুক চাপড়াতে লাগলেন। হাহাকার করতে করতে বললেন, 'দ্রৌপদী তার পঞ্চপুত্র হারিয়ে যে বেদনাটা পাচ্ছে, আমি কর্ণকে হারিয়ে সেই কষ্টটাই পাচ্ছি।'

পঞ্চপাণ্ডব সমস্বরে প্রায় চিৎকার করে বলল, 'মানে!'

'কর্ণ তোমাদের সহোদর ছিল। আমার কুমারী অবস্থার সন্তান ছিল সে। সে অধিরথপুত্র ছিল না, সে ছিল সূর্যপুত্র।' আকুলিত গলায় কুন্তী বললেন।

কৃষ্ণ, পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী—সবাই অবাক বিস্ময়ে কুন্তীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এই সময় তাঁদের কানে ভেসে এল কুন্তীর মর্মন্তুদ আর্তনাদ, 'হা পুত্র, হা কর্ণ। আত্মজ হয়েও মায়ের বাৎসল্য পাওনি তুমি। লোকভয়ে তোমাকে নদীতে বিসর্জন দিয়েছিলাম আমি।'

তারপর পুত্রদের দিকে ফিরে সতেজে বললেন, 'তোমরা যে ওর সহোদর, সেটা কর্ণ জানত, আমিই জানিয়েছিলাম তাকে, একদিন গোপনে তার সঙ্গে দেখা করে। তাই বাগে পেয়েও তোমাদের হত্যা করেনি কর্ণ। তোমরাই তাকে হত্যা করলে, তুমিই নিরস্ত্র কর্ণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলে অর্জুন!' বলতে বলতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন কুন্তী।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঢোলদাস

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঢোলটা সামনে নিয়ে বসে আছে মনমোহন।

ঝুঁকে পড়া ঘরটির উঠানে বিছানো চাটাইয়ে সে বসে আছে। অঘ্রানের শেষ। পৌষ আসি আসি করছে। পড়ন্ত বিকেলের হলুদ রোদ ছড়িয়ে আছে সবখানে। উঠানের কোনার ভাদি গাছের ঝাঁকড়া মাথায়, শিরীষ গাছটির উঁচু ডালে, পানায়ভরা ডোবায়, ছাইয়ের গাদায়, খালপারের ঝোপেঝাড়ে অসুস্থ হলদে রোদ যেন অবসন্ন দেহে শুয়ে আছে। বহুদূরে খাদ্য খুঁজতে যাওয়া পাখিগুলো একটু আগেভাগে নীড়ের দিকে রওনা দিয়েছে। আকাশটা আজ যেন বেশ খোলামেলা। মেঘ নেই। গভীর নীলসমুদ্র যেন ছড়িয়ে আছে গোটা আকাশজুড়ে। প্রকৃতির এই যে অপার সৌন্দর্য, এই যে অফুরান রহস্য মনমোহন দেখে না। ও যে দেখতে পায় না। জন্মান্ধ সে। শব্দ দিয়ে সে প্রকৃতি দেখে, মানুষও। তার কানা বউটিকেও দেখে সে।

ঠিকদুপুরের পর রোদটা যখন একটু মিইয়ে আসতে লাগল, মনমোহনের পরানটাও আনচান শুরু করল। বউকে বলতে লাগল– ও ধনকুমারী, চাটাইটা উঠানে একটু বিছিয়ে দাও না।

ধনকুমারী জানে– বিকেলের দিকে আজলার বাপ উঠানে গিয়ে বসতে চায়। ঢোলটা তখন তার সামনে এগিয়ে দিতে হয়। বয়স হয়ে গেল তিন কুড়ি বছর। বর্ষাবাদল ছাড়া আজলার বাপের এই অভ্যাসের ব্যতিক্রম হয় না। বর্ষায় উঠানে না বসে দাওয়ায় বসে মনমোহন। দু'হাতের এগারো আঙুলে ঢোলের ডায়ে-বাঁয়ে মৃদু তাল ঠোকে। মনমোহনের বামহাতের বুড়ো আঙুল দুটো। যেরকম একটি কলাগাছের পেট চিরে আরেকটি কলাগাছ বের হয়, তেমনি বামহাতের বুড়ো আঙুলের মাঝ বরাবর দিয়ে ছোট একটি বুড়ো আঙুল বেরিয়েছে মনমোহনের। তার শরীরের সবচেয়ে বড় খুঁত অন্ধত্ব, ফলে আঙুলের ওই খুঁতের দিকে মানুষের তেমন নজর পড়ে না। আর নজর পড়লেও মনমোহনের কিছু যায় আসে না। আঙুলের ওই খুঁতটা সে কাজে লাগিয়েছে। উত্তর পতেঙ্গা গাঁয়ের নামকরা ঢুলি এই মনমোহন। তার বাদ্যবাজনা মানুষকে মুগ্ধ করে। অন্য ঢুলির হাতে বাদনক্রিয়া যত শ্রুতিমধুর হয়, মনমোহনের হাতে হয় তার দেড়া। বিশেষ করে বামহাতে ঢোলের বাঁয়াতে যে কারুকাজ তৈরি করে সে, অন্য ঢুলি তার ধারেকাছেও যেতে পারে না। মনমোহন জানে, এটা সম্ভব হয়েছে শুধু তার বাঁ হাতে ছটা আঙুল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আছে বলে। ছটা আঙুলের বাদন-কারুকাজ পাঁচটার চেয়ে তো উত্তম হবেই, যদি ঢুলি বাজাতে জানে। মনমোহন বাজাতে জানে।

আজ উঠানে বসে ঢোলে মৃদু তাল ঠুকছে সে। তালে তালে গুনগুন করছে। সে একটা গানের কলি ভাঁজছে। যারা বাজায়, তারা গানও জানে। কেউ বেশি, কেউ একটু আধটু। মনমোহন শুধু গাইতে জানে না, গান লিখতেও জানে। লিখতে জানে মানে তৈরি করতে জানে। ও তো আর লিখতে পড়তে শেখেনি। আর শিখলেই বা কী, ও তো জন্মান্ধ।

আজ একটা কলি বারবার তার মনে আসছে যাচ্ছে। লাইনটি মনে উদয় হয়ে আবার নিমিষে মিলিয়ে যাচ্ছে। মনমোহন চাইছে সুরের শৃঙ্খলে ওই কলিটিকে বাঁধতে। কিন্তু সুরটাই আজ ভালোমতন কব্জা হচ্ছে না তার। মনমোহনও নাছোড়। সুর দিয়ে কলিকে ডাকছে একবার, আবার শব্দবন্ধ কলি দিয়ে সুরকে লোভিত করতে চাইছে। কলি আর সুর দুজনেই দূরে দূরে আজ। কেউ কারও কাছে ধরা দিতে চাইছে না। দুজনে দুজনকে ভালোবাসে, কিন্তু কাছে আসতে চায় না। একবার কাছে এলেই চিরবন্ধন। এই বন্দিযুগল তখন মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে ফেরে, যুগ থেকে যুগান্তরে।

শেষ পর্যন্ত সুর ধরা দিল কলির কাছে, কলি নিজেকে ভাসিয়ে দিল সুরের স্রোতে। মনমোহনের গলা দিয়ে বেরিয়ে এল– কিসে ধৈর্য ধরি সখী গো/আমার প্রাণবন্ধু বিনে/আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেছে/থাকি কেমনে।

গলা ছেড়ে গাইতে লাগল মনমোহন। গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজনাও চলতে লাগল। মনমোহনের এই এক গুণ। ভেবেচিন্তে কথা বানাতে হয় না। প্রথম লাইনটা এলেই হল। পরেরগুলো আপনাতে আসে। শিক্ষিত গীতিকারদের গানে যেমন লয়-তাল-ছন্দ ঠিকঠাক থাকে, মনমোহনের গানে তা থাকে না। ছন্দে-পর্বে কিছু না কিছু খামতি থেকেই যায়। তাতে কিছু যায় আসে না। তার দরদভরা কণ্ঠস্বর সেই ঘাটতি মিটিয়ে দেয়। শ্রোতারা বুঝতেই পারে না– কোথায় মাত্রার ঘাটতি হল কি ছন্দ পড়ে গেল।

পড়ালেখা জানে না মনমোহন। ভেতর থেকে কথার একটা ঢেউ আসে মাঝে মাঝে। শব্দ জড়িয়ে জড়িয়ে ভাবের একটা ঘূর্ণি তৈরি হয় তার মধ্যে। শব্দ আর ভাবের জড়াজড়িতে সুর এসে মেলে। এই তিনে মিলে গান হয়ে বেরোয় মনমোহনের গলা দিয়ে। গানগুলো লিখে রাখার কারবার নেই। কে লিখবে? সে নিজে এবং গান যারা শুনতে আসে তার উঠানে বা দাওয়ায়, কেউতো লিখতে পড়তে জানে না। তবে ছিদামের ওই এক বিশেষত্ব। একবার শুনলেই মুখস্থ হয়ে যায়। পাশের বাড়ির ছিদাম। মাছ ধরে আর গান শোনে। মনমোহনের গলা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শুনলেই বেরিয়ে আসে তার ভাঙা ঘরটি থেকে। সামনে বসে গানের কথা গেলে। শ্যামতারার বাপ বলে– মনমোহন জেঠার গানের গুদাম যেন ছিদামদা। যা শোনে, তাই মুখস্থ হয়ে যায়। ছিদাম মৃদু হেসে বলে, 'ভালা লাগে মোহন জেডার গান। আপনাআপনি মুখস্থ হইয়ে যায়।'

আজও মনমোহনের গলা শুনে বেরিয়ে এসেছে ছিদাম। ধীরে ধীরে এসে জুটেছে হলধর, শ্যামতারার বাপ, কালাবাঁশি, এ রকম আরও কজন। মনমোহন গাইছে—

প্রেমনদীতে নিদারুণ ঢেউ
সদা উঠে অন্তরেতে
দেখে নারে কেউ।
কার কাছে কই মনের দুঃখ
বুঝে না দরদি বিনে।

হলধর বলে উঠল, 'জয় রাধেশ্যামের জয়।'

ঢোলে তাল ঠুকে ঠুকে মনমোহন গেয়ে চলেছে—

কুলের বাহির হয়ে যাব
কলঙ্কের হার গলে দিব
সে বন্ধুর কারণে।
কাঙাল মনমোহন অভিলাষী
রাধাকৃষ্ণের রূপ দর্শনে।

গান শেষ হয়ে গেল, বাদন চলতে থাকল। কখনো শিরদাঁড়া সোজা রেখে, কখনো ঢোলে মাথা ঠেকিয়ে মনমোহন আরও বহুক্ষণ বাজিয়ে গেল। সে বাজনায় মনমোহনের সুখদুঃখ, মনমোহনের অতীত-বর্তমান জড়িয়ে থাকল।

মনমোহনের বাপ লক্ষ্মীপদ ছোটোখাটো মানুষ ছিল। কুঁজো হয়ে হাঁটত। হাঁটতে ডানে বাঁয়ে থুতু ফেলত। কারণে অকারণে ওয়াক থু করত। কুঁজোর কারণে হোক বা অভ্যাসের কারণে, মাথা নিচু করে হাঁটত লক্ষ্মীপদ। তার নাম লক্ষ্মীপদ হলেও লক্ষ্মীদেবী কোনো দিন তার দিকে পদ এগিয়ে ধরেনি। গোটা জীবনটাই তার ক্ষয় হয়েছে পরিবার-পরিজনের ভরণে পোষণে। লক্ষ্মীপদের ভারী পরিবার। বউ, তিন ছেলে, এক মেয়ে। বুড়ো মা-বাপ তো ছিলই। এদের অন্ন জোগাতে গিয়ে দিনেরাতে সমুদ্রে-খালে-বিলে পড়ে থাকতে হতো তাকে। জগন্নাথ জেঠা দুঃখ করে বলত– তোর নেংটিটা আর শুকাল না রে লক্ষ্মী! লক্ষ্মীপদ জেঠার কথা শুনে কিছু বলত না। কোমরটাকে একটু সোজা করে জেঠার দিকে একপলক তাকাত। তারপর ক্লিশ একটা হাসি দিত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লক্ষ্মীপদ যখন কাঁধে জাল-দুঈজ্যা নিয়ে খালপার বেয়ে সমুদ্রের দিকে যেত, পেছন থেকে জেলেপাড়ার ছানাপোনারা আওয়াজ দিত– ভাপা পিঠা খাজুর রস, ফুরৎ। লক্ষ্মীপদ না শোনার ভান করে এগিয়ে যেত। কিন্তু ক্ষেপে যেত যখন কোনো বয়স্ক লোক আওয়াজ দিত। তার মুখ দিয়ে গাল বেরিয়ে আসত অজস্রধারায়। 'তোর মারে বোনেরে' দিয়ে শুরু হয়ে সেই গালি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসত। আওয়াজ দেওয়া লোকটি পালিয়ে বাঁচত।

লক্ষ্মীপদের বউটি ছিল বিশাল দেহের। পাশাপাশি হাঁটলে লক্ষ্মীপদ কোমরে পড়ে থাকত। এজন্য যশোদাবালার কোনে আফসোস ছিল না। বউদিরা ঠাট্টা করে বলত, 'যশোদা পারস কেমনে?'

যশোদাবালা হাসতে হাসতে বলত, 'চারটা বিয়াই ফেললাম বউদি।'

বউদিরা মুখে আঁচল চাপা দিত।

যশোদাবালার মেয়েটি অবশ্য বেশিদিন বাঁচেনি। তেরোতে পড়েছিল, বিয়ের কথাও প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল। একরাতের ভেদবমিতে মারা গেল মেয়েটি। রাতে পচা লাম্বুমাছ রেঁধেছিল যশোদা। রাধানাথ বহদ্দারের জালে ধরা পড়েছিল লাম্বুমাছটি। কেটেকুটে পাড়াপড়শিদের মধ্যে বিলিয়েছিল রাধানাথ। অন্যদের কিছু হল না। মাঝখানে প্রাণ হারালো যশোদাবালার বিবাহযোগ্য মেয়েটি।

লক্ষ্মীপদের তিন ছেলে– ক্ষীরমোহন, মনমোহন আর লালমোহন। ক্ষীরমোহন বাপের মতন ছোটোখাটো। একটু কুঁজোটে শরীর। মনমোহন অন্ধ। আর লালমোহন ছিপছিপে, মাঝারি উচ্চতার। বড় হয়ে ক্ষীরমোহন গাঁজায় ভেসে গেল, আর রসিক লালমোহন চড়ে বসল পাড়ার আয়-আয় থই-থই জাতীয় মেয়েদের নৌকায়। মুখে তার পান আর গান। পান চিবোতে চিবোতে যদুনাথের বাড়ির পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গাইতে লাগল—

দিদি তোর পানশিখানা
একবার আমায় বাইতে দে'না
বাইলে পানশি ভালো থাকে
শ্যাওলা জমে না।

মনমোহন অন্যরকমভাবে বড় হতে লাগল। এমনিতে পাটি-মাটির জীবন তাদের। একটা লম্বা মতন ঘরে সবাই শোয়। মাটির মেঝেতে ভাঙা পাটি বিছিয়ে দেয় যশোদাবালা। ওখানেই পাশাপাশি তিন ভাই শুয়ে রাত কাটায়। যশোদা শোয় ঘরের কোনায়। দাওয়ায় শোয় লক্ষ্মীপদ। কোনো কোনো রাতে যশোদা চুপিচুপি দাওয়ায় আসে। একদিন টুপটাপ করে লক্ষ্মীপদের বুড়ো মা আর বাপ মারা গেল। ক্ষীরমোহন সেয়ানা হয়ে স্টীল মিলে সুইপারের চাকরি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধরল। লালমোহন বাউণ্ডুলেই থেকে গেল। মায়ের চাপাচাপিতে কোনো দিন হুরিজাল নিয়ে দইজ্যাতে নামলেও পরের সাতদিন কানে তুলো দিয়ে থাকল। বাবরি চুল রেখে মনসাপুথি আর গানে মজে থাকল লালমোহন। জীবনের প্রথমদিকে প্রাইমারি স্কুলে কয়েক ক্লাস পড়ালেখা করেছিল সে। 'মহাভারত' আর 'মনসাপুথি' সুর করে পড়তে জানত লালমোহন।

মনমোহনের জীবনটা অন্য দুই ভাইয়ের মতো হল না। সে রোজগার করতে পারে না, পুথি পড়তে পারে না। বাবা তো বুড়ো হয়ে গেল। মা-ভাইদের রোজগারে পেট চলে তার। লক্ষ্মীপদ বুড়ো হয়ে গেলে যশোদা সংসারের হাল ধরেছিল। ক্ষীরমোহনের বেতন আর লালমোহনের টুকটাক আয় সেই হালে পানি জোগাত।

ভাইদের মধ্যে মনমোহনের স্বাস্থ্য ভালো। কুরুভাইদের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র যেন সে। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ কিন্তু শরীর ছিল শালপ্রাংশু। মনমোহনও তাই। ধৃতরাষ্ট্ররা তিন ভাই ছিল– ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু আর বিদুর। 'মহাভারত'কালে শান্তনু নামে এক রাজা ছিলেন। একদা সমুদ্রতীরে বেড়াবার সময় দাশরাজার কন্যা মৎস্যগন্ধার প্রেমে মজলেন। মৎস্যগন্ধা সত্যবতী হয়ে প্রধান মহিষী হিসেবে শান্তনুর রাজপ্রাসাদে এলেন। ওদের ঘরে দুই পুত্র জন্মাল– চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। চিত্রাঙ্গদ অকালে মারা গেল। বয়সকালে কাশীরাজের দুই কন্যা অম্বিকা আর অম্বালিকাকে বিয়ে করল বিচিত্রবীর্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিয়ে করার অল্পকাল পরেই ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে অপুত্রক অবস্থায় মারা গেল বিচিত্রবীর্য। কুরুবংশে সংকটকাল উপস্থিত হল। বংশধারা লোপ পেতে বসল। রাজা শান্তনু তখন পরলোকে। সত্যবতী ঠিক করলেন—বংশধারা লোপ পেতে দেওয়া যাবে না। নিজের কুমারীপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের আহ্বান জানালেন সত্যবতী। পরস্ত্রীতে কার না আগ্রহ! তাও আবার মুনিঋষি। পরনারী দেখে যুগে যুগে তো মুনিঋষির বীর্যপাত হয়েছে। এটাতো আর রতিপাতের ব্যাপার নয়, একেবারে সঙ্গমের আহ্বান। ব্যাসদেবও রাজি হয়ে গেলেন। অম্বিকা-অম্বালিকা রাজি হল কিনা? নারীদের আবার রাজি-অরাজি কী? যুগযুগান্তর ধরে তো মেয়েরা হাতের পুতুল।

একরাতে শয্যাপাতা হল অম্বিকার কক্ষে। ব্যাস আসবেন, অম্বিকার সঙ্গে মিলিত হবেন।

ব্যাসের বিপুল আকৃতি। দেহের রং ঘোর কৃষ্ণবরন। দীপ্ত নয়ন। পিঙ্গল জটাশ্মশ্রু। দিনের আলোতেই ভয় পাবার কথা। এ তো রাত। ভীষণদর্শন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ব্যাসদেবকে দেখে সঙ্গমকালে চোখ বুজে থাকল অম্বিকা। যথাকালে পুত্র সন্তান হল তার, অন্ধপুত্র। এই পুত্রই ধৃতরাষ্ট্র। মা সত্যবতীর আশা পূরণ হল না। তাঁর চাই সর্বাঙ্গসুন্দর নাতি। আবার আহ্বান করলেন কানীনপুত্র ব্যাসকে। এবার অম্বালিকার পালা। অম্বালিকা চোখ খোলা রাখল বটে, কিন্তু ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হল। সেই পুত্রের নাম পাণ্ডু। সে চক্ষুষ্মান হল, কিন্তু প্রাণশক্তি আর দৈহিক বলে ধৃতরাষ্ট্রের তুলনায় পিছিয়ে থাকল। একজন অন্ধ, অন্যজন অকাজের, সত্যবতীর মন অতৃপ্তিতে ভরে গেল। অম্বিকার সঙ্গে মিলিত হয়ে একজন সুস্থ ছেলে জন্ম দেবার জন্য ব্যাসকে আবার নির্দেশ দিলেন সত্যবতী। এবার দুই সতীনে শলাপরামর্শ করে এক সুন্দরী দাসীকে পাঠাল সঙ্গম-বিছানায়। এই ছেলে সুস্থ-সুন্দর হল। কিন্তু ও যে দাসীপুত্র। বিদুর তার নাম। তিনজনই বড় হল। ধৃতরাষ্ট্র বলবান, রাজ্যলোভী। পাণ্ডু ভ্রমণপাগল, ক্ষীণকায়। আর বিদুর বিচক্ষণ কিন্তু উদাসীন উদাসীন।

এদের সঙ্গে মোহন ভাইদের মিল আর অমিল। পাণ্ডুর সঙ্গে ক্ষীরমোহনের আর বিদুরের সঙ্গে লালমোহনের মিল। বিদুরের মতো লালমোহন সংসারে আছে, কিন্তু সংসার তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। কী রকম যেন আনমনা উদাসীন সে। গানে আর পরনারীতে সে নিজেকে খুঁজে ফিরে। বিয়েটাই করল না শেষ পর্যন্ত।

বাপ বেঁচে থাকতেই ক্ষীরমোহন বিয়ে করল। বউটি চালাক। তার দেহের প্রতি স্বামীর টান থাকতে থাকতেই ক্ষীরমোহনের কানে বিষ ঢালল বউটি। একদিন ক্ষীরমোহন অকারণে ঝগড়া বাধালো ভাইদের সঙ্গে। বলল, 'আজ থেকে তোদের সঙ্গে আমি নেই।' আলাদা হয়ে পূর্বপাড়ার হরেন্দ্রের খালি ভিটেয় ঘর তুলল।

ক্ষীরমোহনের মা-বাপ মনমোহনকে নিয়ে জলে পড়ল। লালমোহন কোথায় কোথায় ঘোরে। দু'চার দশদিনের জন্য কোথায় ডুব দেয়। তার হদিস মেলা ভার।

মনমোহন বলল, 'আমি তোমাদের বোঝা হলাম মা।'

মা যশোদা করুণকণ্ঠে বলে, 'বোঝা কেন বলতাছস বাপ। তুই তো আমাদেরই পোলা। আমরা খাবার জোটাতে পারলে তুইও খাবি, আর জোটাতে না পারলে আমাদের সঙ্গে উপোস....।' বাক্য শেষ হয় না যশোদার। গলাটা ধরে আসে। দ্রুত সামলে নেয় নিজেকে। বলে, 'তুই তো ঢোল বাজাতে পারিস। বৈরাগী ঢুইল্যাকে বলে দেখি, ওর বাদনদলের লগে তোরে লয় কিনা।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বৈরাগী ঢোলী মনমোহনকে তার দলে টেনে নেয়। বিয়েশাদির অনুষ্ঠানে নিয়ে যায়। ঢোল বাজায় সে। প্রথম প্রথম তালে ছন্দে একটু আধটু ভুলভাল করত। পরে সে পাক্কা ঢুলি।

একটা সময়ে মা-বাবা জেদের বশে তাকে বিয়ে করাল। বিয়ের আগে নানা হ্যাপা। জন্মান্ধকে বিয়ে দেবে কে? শেষ পর্যন্ত মেয়ে পাওয়া গেল। হালিশহর গাঁয়ের রুহিদাশের মেয়ে ধনকুমারী। ধনকুমারীর আবার এক চোখ নাই। যশোদা বলল, 'তাতেই সই। আমার পোলা তো আন্ধা। আন্ধা ছেলের কানা বউ। অসুবিধা কী?'

অসুবিধা তেমন কিছু হল না। ধনকুমারী শ্বশুরবাড়িতে এসে সবকিছু গুছিয়ে-গাছিয়ে নিল। মনমোহনকেও সে পছন্দ করল। মন্দ কী তার স্বামীটি? শুধু চোখে দেখে না, এই তো। আর সবকিছু তো ঠিকঠাক আছে। বলবান। নীরোগ। পাকা বাজিয়েও সে। দু'চার দশ গ্রামে মনমোহনের নামডাক। আয়-ইনকামও কম না তার।

ধনকুমারীর হাতে পড়ে শেষজীবনে সুখ পেয়েছিল যশোদা আর লক্ষ্মীপদ। বেশ আদর যত্ন নিয়েই মরেছিল তারা। লালমোহন শেষের দিকে কোথায় যে হারিয়ে গেল। শেষবার মনমোহনের বিয়েতেই তাকে দেখা গিয়েছিল। বিয়ের আসরে নেচেটেচে গানটানও করেছিল। তারপর একদিন টুপ করে কোথায় চলে গেল। গত ত্রিশটি বছর তার আর কোনো দেখা নেই।

মনমোহনের ঘরে দু'দুটো জোয়ান ছেলে। ছোটটা মেদামারা, বড়টা গাঁট্টাগোট্টা। ছোটছেলে আজলা চুপচাপ। বলার চেয়ে শুনতে পছন্দ করে বেশি। বড়ছেলে কমলহরি মারকুটে। যার তার সঙ্গে ঝগড়ায় জড়ায়। তবে আয়-ইনকামের দিকে বেশ মন তার। তার আয়েই মনমোহনের সংসার চলে এখন।

ধনকুমারী যেরাতে বলল, 'তোমার ছেইলে হবে', অন্ধকারে হাতড়ে বউকে বুকে টেনে নিয়েছিল মনমোহন। বলেছিল, 'ছেইলে হবে বুইঝলে কেমনে?'

'মন ডাকছে।' ধনকুমারী বলেছিল।

সেরাতে ঘুমাতে পারেনি মনমোহন। মন শুধু কু ডেকেছিল– তার ছেলে যদি তার মতো অন্ধ হয়! যদি দুচোখ ছাড়া জন্মায় ছেলেটি! কী হবে তাহলে! ধৃতরাষ্ট্র তো আন্ধা জন্মেছিল। লালমোহন যখন খুব উড়তে শেখেনি, ওই সময় ভাইকে ডেকে কাছে বসাত মনমোহন। 'মহাভারত'টা পড়ে শোনাতে বলত। মেজভাইয়ের পাশে চাটাইয়ে বসে সুর করে কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' পড়ে যেত লালমোহন। সেই সুরের সঙ্গে মিলিয়ে এগারো আঙুলে ঢোলে তাল ঠুকত মনমোহন। এইভাবে গোটা 'মহাভারত'টাই একসময় শোনা হয়ে গেল তার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ধৃতরাষ্ট্রের কথাই ভেবেছিল মনমোহন, সেরাতে ঘুমন্ত বউয়ের পাশে শুয়ে শুয়ে। ধৃতরাষ্ট্র কেন অন্ধ হল? 'মহাভারত'কার বলেছেন, সঙ্গমকালে মা অম্বিকা চোখ বুজে ছিল। মা চোখ বুজে থাকার কারণেই তো ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হল। বাপ অন্ধ হলে কি সন্তান অন্ধ হয়? 'মহাভারতে' উল্লেখ নেই তো। সে অন্ধ হলে ছেলেও যদি জন্মান্ধ হয়? না, না, তা হবে কেন? মায়ের কথাই তো বলা আছে 'মহাভারতে'। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল ধনকুমারীর কথা। ধনকুমারীর তো এক চোখ নাই। ও যখন ধনকুমারীর সঙ্গে মিলিত হয়, ওর তো এক চোখ বোজা থাকে। মায়ের দুই চোখ বোজা থাকার কারণে ধৃতরাষ্ট্রের যদি দুই চোখ আন্ধা হয়, ধনকুমারীর এক চোখ বোজা বলে, নিশ্চয় তার আগত সন্তানের এক চোখ অন্ধ হবে। 'মহাভারতে'র কাহিনী তো সেই কথাই বলে। 'মহাভারত' যে সে বই তো নয়, হিন্দুধর্মে গীতা'র পরেই তো এর স্থান। সুতরাং 'মহাভারত'কে ফেলে দেয় কী করে মনমোহন? বুকটা তার কেঁপে ওঠে। হায় ঈশ্বর, তাদের কি তাহলে অন্ধ বা কানা সন্তানই হবে! সেরাতে আর ঘুম আসেনি মনমোহনের দুচোখ জুড়ে।

কমলহরি চক্ষুষ্মান হয়েই জন্মেছিল। যে সন্ধ্যায় ঘরের ভেতর থেকে ধরণীবালা বলল, 'ছেইলে হইয়েছে', মনমোহন প্রথমেই ধাইমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'চোখগুলো ঠিকঠাক আছে তো মাসি?'

'তুই চিন্তা করিস নারে মনমোহন, তোর পোলা দুই চউক্ষু খুইলে এইদিক ওইদিক তাকাচ্ছে।' বলেছিল মাসি। শুনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জোড়হাত তুলেছিল মনমোহন।

আজ মনমোহনের ঘর-উঠান নাতি-নাতনিতে কিলবিল। কমলহরি দাদু লক্ষ্মীপদের মতো খালে-বিলে-সমুদ্রে হুরিজাল-টাউঙ্গাজাল ঠেলে। মাঝে মাঝে বহদ্দারের নৌকায় গাউর খাটে। আজলা বাপের পেশাটাই নিয়েছে। বাপ তো আর এখন বিয়েশাদিতে বাজাতে যেতে পারে না, বৈরাগী ঢুলিও মরে গেছে কবে। আজলা নিজেই একটা দল গড়েছে। ওই দলের প্রধান ঢুলি আজলা। ছোটছেলের কাণ্ড দেখে খুব খুশি হয়েছিল মনমোহন। পাশে বসিয়ে ঢোলবাজানোর অন্ধিসন্ধি শিখিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, 'যে সে গাছ দিয়ে ঢোল হয়নারে বাপ। আম-কাঁঠাল-গাউরি-নিমগাছের গুঁড়ি দিয়ে ভালো খোল হয়। সবচাইতে টেকসই হয় টুরি আমগাছের খোল। খাসির চামড়ার ছাউনিই উত্তম। ঢোলের কড়াগুলো পিতলের হতে হয়। না হইলে বাজনা ফুটে না।'

এসব বলার পর তাল-লয়ের কথা বলেছিল মনমোহন। বলেছিল, 'মনে রাখবা, ঢোলের বাদ্যি হইল মানুষেরে জানান দেওয়ার জইন্যে, অমুকের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পোলার লগে তমুকের মাইয়ার বিয়া হইছে অথবা অমুকের ঘরে একটা নতুন সন্তান আইছে। তয়, এই সকল সুসংবাদ দেওনের লাইগা ঢোলের আওয়াজের দরকার হয়। সেই আওয়াজ যদি মিডা না হয়, সুরতাল যদি ঠিক না থাকে ঢোলবাদনের, তাইলে মানুষরা বিরক্ত হয়। আমি যেমুন আবোলতাবোল বাজাইয়া মানুষেরে বিরক্তি দেই নাই, তুইও দিবি না আশা করি। তোরে অনেক দূর আগাইয়া যাওন লাইগবো।'

মনমোহনের মনে এখন খাওনদাওনের তেমন চিন্তা নেই। ছেলেরাই অন্নবস্ত্র জোগায়, তার আর তার বউয়ের। তবে একটা চিন্তা তাকে কুরে কুরে খায়। তার জন্মভিটেটি খালের ভোগে যেতে বসেছে। একেবারে খালপারেই তার ঘরটি। ভিটেটির পেছনেই দক্ষিণ থেকে উত্তরে নেমে গেছে খালটি। ওপারে ঠিকঠাক, খালটির যত লোভ এপার ঘিরেই। জোয়ার এলে টুপটাপ করে একটা দুটো ঢেলা ঝরে পড়তে থাকে, মনমোহনের ভিটের দিককার পার থেকে। বর্ষা এলেই খালটির ক্ষুধা বাড়ে। তখন টুপটাপ নয়, একেবারে ঝুপঝাপ করে ভাঙতে থাকে পারটি। মনমোহনের ঘরটির পেছনে এক চিলতে জায়গা ছিল। ওখানে ছাইটাই ফেলত বউরা। অকাজের কিছু গাছও ছিল ওখানে। গেল বর্ষায় ওই জায়গাটিই গিলে ফেলল নষ্ট খালটি। কিছু বাঁশটাশ গেড়ে-পুঁতে কোনোরকমে বসতভিটেটা বাঁচাতে চাইছে ছেলেরা। তাদের চিন্তান্বিত কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, সামনে তাদের বড় বিপদ। সুদিনটা কোনোরকমে গেলেও বর্ষাটা কাল হয়ে উঠবে। বর্ষায় তো জলের ক্ষুধা বেশি। তখন কোথায় গিয়ে উঠবে মনমোহনরা! খাওয়াটা না হয় কমবেশি এবেলা ওবেলা জোটে, মাথা গোঁজার ঠাঁইটা কোথায় জুটবে!

সেদিন বিকেলে ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি এল। শেষ জ্যৈষ্ঠের দিকে ভ্যাপসা গরম পড়েছিল। চারদিকে হাঁসফাঁস, সবারই অস্বস্তি। জেলেপাড়ার অনেকের গায়ে গতরে ঘামাচি। বৃষ্টির জন্য সবার হা-হুতাশের অবধি নেই। হঠাৎ বিকেলের দিকে দক্ষিণ আকাশে মেঘ জমল। ঘন কালো মেঘ। সেই মেঘ এগিয়ে এল উত্তর পতেঙ্গার দিকে। এরপর ঝপঝপিয়ে বৃষ্টি। একূল ওকূল আঁধার করা বৃষ্টি। সেইবেলা ঢোল নিয়ে দাওয়ায় বসল মনমোহন। মৃদুলয়ে আঙুল চালাতে থাকল ঢোলের ডায়ায় এবং বাঁয়ায়।

মনমোহনের আজকের বাদনে কোনো প্রাণ নেই। দুঃখরা তার মনকে চেপে ধরেছে আজ। মা-বাপ হারানোর দুঃখ, তাদেরকে সুখ দিতে না পারার দুঃখ। মনমোহনের বড় দুঃখ বউয়ের কানফুসলানিতে বড়দা ক্ষীরমোহন তাদের ফেলে চলে যাবার জন্য। মনমোহনের সবচাইতে বড় দুঃখ লালমোহনের জন্য। বড়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসত সে এই ছোটভাইটিকে। কী রকম দরদ দিয়ে 'মহাভারত' পড়ত লালমোহন! যে অংশে কর্ণ আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে ঘটোৎকচকে হত্যা করল বা যেখানে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যের মাথা কেটে নামাল অথবা দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে অশ্বত্থামা-কৃপাচার্যরা রাতের বেলা পাণ্ডবশিবিরে গিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল, সে অংশগুলো কী নিদারুণ করুণ সুরে পড়ে যেত লালমোহন! শুনতে শুনতে কখন দু'চোখ থেকে জলের ধারা নামত, বুঝতে পারত না মনমোহন। তার এই ভাইটি কেন যে কোথায় হারিয়ে গেল, বুঝে উঠতে পারে না সে। লালমোহনের কথা মনে হলে ভেতরটা টনটনিয়ে ওঠে মনমোহনের।

তার নিজের জন্য কোনো দুঃখ নেই মনমোহনের। নিজের মধ্যে সে আলাদা একটা জগৎ তৈরি করে নিয়েছে। সেখানে স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, নাতি-নাতনিও নেই। এ জগৎ তার একান্ত নিজস্ব। তার জগতে বর্ণ নেই, শব্দ আছে। এ জগৎ দেখার নয়, শোনার। শব্দ শুনে শুনে সে নিজের মনের মধ্যে একটা অবয়ব তৈরি করে। ভোরে নানা পাখির শব্দ শোনে সে, কোনোটা কর্কশ, কোনোটা মধুর। ওসব পাখিরও একটা চেহারা এঁকে ফেলে সে মনের কোণে। ধনকুমারীর কণ্ঠ শুনে শুনে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করতে করতে ওর একটা কাঠামো তৈরি করে নিয়েছে মনমোহন। শব্দ দিয়ে সে স্ত্রী ধনকুমারীকে দেখে। শব্দ দিয়ে মানুষ বোঝে সে। ও পাড়ার ওই যে কাশিরাম সর্দার, কী রকম ধমকে ধমকে কথা বলে সবার সঙ্গে, তার চেহারা তো বিদ্‌ঘুটে হওয়াই স্বাভাবিক। বউয়ের কাছে জিজ্ঞেস করেছিল কাশি সর্দারের চেহারার ধরন। তার মনে তৈরি চেহারার সঙ্গে বউয়ের দেওয়া বিবরণ অনেকটাই মিলে গিয়েছিল– মোটা থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট, উঁচু চোয়াল, বলবান, কালো রং।

এইভাবে প্রতিটি শব্দ বস্তু হয়ে ধরা দেয় মনমোহনের কাছে। শব্দ আর বস্তু একাকার হয়ে যায় তার নিজস্ব জগতে। মনমোহন শব্দকে শব্দ, বস্তুকে বস্তু হিসেবে স্বতন্ত্রভাবে শুনতে আর দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু অন্ধ বলে তার কাছে শব্দ আর বস্তু স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে ধরা দিল না কোনোদিন। এই তার বড় বেদনা। এই বেদনা থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মুক্তি নেই মনমোহনের।

এই সময় অঝোরধারায় বৃষ্টি পতনের শব্দ মনমোহনের গোটা অস্তিত্বজুড়ে প্রতিধ্বনি তুলল। এই ধ্বনিঢেউ তার রক্তকণিকায় আলোড়ন তুলল। হঠাৎ করে তুমুল আবেগে সে ঢোল বাজাতে শুরু করল। ঢোলের শব্দ জলে ভিজতে ভিজতে খাল পেরিয়ে, জেলেপাড়া ছাড়িয়ে, মাঠ-প্রান্তর-বনভূমির ওপারে দূরদিগন্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও